প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : ময়ূখ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রক : রঞ্জনকুমার দাস, শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

'যবনিকা কম্পমান' বেরিয়েছিল সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়, 'দূর দুর্গম' 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে'। 'ড্রাগনের থাবা' চীনা আক্রমণ নিয়ে লেখা।

এই তিনটি লেখার পেছনে আছে সাগরময় ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী এবং মনোজ বসুর উৎসাহ। 'দূর দুর্গম' পরিচ্ছেদে হাইনরিখ হারেরের 'তিব্বতে সাত বছর' বই থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়েছি।

—লেখক

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
শ্রীশেফালি দস্তিদার
শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকের

মুখের ভাষা বুকের রুধির (২য় মুদ্রণ)

অন্য নগর দর্শন

অচেনা শহর কলকাতা

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের সৌজন্যে বইয়ের যাবতীয় ছবি, ম্যাপ এবং ব্লক (হারের ও লেখকের ব্লকখানা বাদে) পাওয়া গেছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড্রাগনের থাবা

এবারেও ডেনজং হোটেল। সাড়ে তিন বছর আগে দলাই লামা যখন লাসা ছেড়ে ভারতের পথ ধরেছেন, কেউ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় প্রথম উঠেছিলাম গ্যাংটকের এই ছোট হোটেলে।

তিব্বত, ভূটান, নেপাল এবং ভারতের মাঝখানে ছোট্ট রাজ্য সিকিম। তারই রাজধানী গ্যাংটক। হিমালয়ের কোলে ছবির মত সুন্দর শহর। দার্জিলিং, কালিম্পং শিলিগুড়ি থেকে রাস্তা এসে ধাক্কা খেয়েছে রংপোয়। সেখান থেকে চড়াই ভেঙে ভেঙে গ্যাংটক। বাজারের কাছে মোড় ঘুরতেই হোটেল ডেনজং—তিব্বতী ভাষায় যার অর্থ 'চালের উপত্যকা'। অর্থাৎ কিনা 'সিকিম'।

১৯৬২ সালের ১৮ই অক্টোবর। আনন্দবাজারের বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে কালিম্পং দার্জিলিং ঘুরে এসেছি গ্যাংটক। সঙ্গে আমাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত। উদ্দেশ্য চীনা অনুপ্রবেশের রোমহর্ষক বিবরণ সরবরাহ।

সফর করতে হবে গোটা উত্তর পূর্ব সীমান্ত। ঘুরতে হবে হঠাৎ জাগ্রত হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। আর দেরি নেই, ওই পার থেকে ড্রাগনের থাবা ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে।

এইমাত্র ঘুরে এসেছি শেরাথাং। গ্যাংটক নাথুলা ইয়াতুংয়ের পথে। শেষ সীমান্ত নাথু গিরিপথ পর্যন্ত যেতে পারিনি। বরফের কামড় পা আটকে দিয়েছে। ফেরার পথে শুধু ভেবেছি, কী দুর্জয় মনোবল নিয়ে আমাদের সীমান্তরক্ষী জওয়ানেরা দিনের পর দিন এই তুষারাবৃত গিরিকন্দরে অতন্দ্র পাহারা দিয়ে আসছে।

হোটেল ডেনজঙের যে ঘরটায় আমরা দুজনে আছি, তার

জানালা দিয়ে সোজা দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা মুকুট। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি গত এক মাস থেকে কম্যুনিস্ট চীন আবার নে-ফা এলাকায় হামলা শুরু করল কেন? কেন কামেং ডিভিশনের ঢোলা চৌকিতে গুলীর পর গুলী চালিয়ে এই সেদিন আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল? মিত্রতার প্রতিদান কি এই!

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত পা লেপের তলায় গুটিসুটি ঢুকে পড়েছে। নীচে শুনতে পাচ্ছি তিব্বতী আর নেপালী ভাষার কিচিরমিচির। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে বাজারের পথে চলেছে খচ্চরের সারি। দূরে সিনেমা হাউস থেকে ভেসে আসছে হিন্দি গানের কলি। বাড়িতে বাড়িতে পতপত উড়ছে প্রার্থনা-পতাকা।

বিশু ছিল বাইরে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে হাজির। বললে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, এইমাত্র রেডিওতে বলেছে চীন খিনজেমানে ও ঢোলা নিয়ে নিয়েছে। প্রবলবিক্রমে হাজার হাজার সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতের বুকে।"

লেপের আদর হেলায় প্রত্যাখ্যান করে উঠে বসলাম। উত্তেজিত বিশু আবার বললে, "ঢোলার চৌকি থেকে আমরা পিছু হটে এসেছি। চীনা সৈন্য এখনও এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘায়েল করে মাটিতে ফেলেছে আমাদের একটি হেলিকপটার।"

"যুদ্ধ তাহলে লেগেই গেল"—আমি ভাঙা গলায় বলি।

"চল ভাই পালাই কলকাতা," বিশুর গলায় ভয়ের চিহ্ন— "হয়তো আজকালের মধ্যে নাথুলা দিয়ে ধূর্ত চীনারা ঢুকে পড়তে পারে।"

"শুধু ধূর্ত নয়, বল বিশ্বাসঘাতক শয়তান"—আমি ততক্ষণে উঠে বসেছি।

সংবাদ সত্যি সত্যি অশুভ। এতদিনের আশংকা অবশেষে ভয়ংকরের বেশে দেখা দিল। যুদ্ধ আমরা চাইনি, সেই পথেই

কিন্তু আমাদের ঠেলে দিল পররাজ্যলিপ্সু চীন, সম্প্রসারণবাদী চীন। বিষণ্ণ মন নিয়ে তাকালাম পেছনের দিকে।

চীন-ভারতের মধুর সম্পর্কের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। ভগবান তথাগতের অহিংসার বাণী ভারতই শুনিয়েছে চীনকে। প্রথম শতাব্দীর শুরুতে সম্রাট কনিষ্কের ধর্মদূত চীনে গিয়েছিল, দু' দেশের মানুষকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে।

তারপর একে একে ভারতে এলেন চীনা পরিব্রাজকের দল,—ফা-হিয়ান, হিউয়েনসাং, ইৎ-সিং। ফা-হিয়ান ছিলেন দশ বছর এদেশে—খ্রীঃ ৪১০ থেকে খ্রীঃ ৪২০। তাঁর আগমনের পর মিত্রতার যাত্রায় এলেন হিউয়েনসাং। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে খ্রীঃ ৬৩০ শতকে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি কাটিয়ে গেছেন ভারতের ধর্মপ্রাণ, শান্তিকামী মানুষের সান্নিধ্যে।

এই যাত্রার বিরাম ছিল না। শত শত ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে চীনা পরিব্রাজকের দল নিয়ে গেছেন নিজের দেশে। ভারতের বহু তীর্থযাত্রী গিয়েছেন চীনদেশে মৈত্রীর বন্ধন অটুট রাখতে। এই যাত্রা আধুনিক বিংশ শতাব্দীতেও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এ যুগের চীন-ভারত মৈত্রীর উদ্গাতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ চীন পরিভ্রমণে তিনি গিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে। ১৯৩৮ সালে জাপানী কবি নোগুচির পত্রের উত্তরে চীনের পক্ষ সমর্থন করে কবি লিখেছিলেন—"চীনের দুঃখ আমার অন্তরে যে আঘাত হেনেছে, শুধু তাতেই আমি ব্যথিত নই, আমার দুঃখ যে, গর্বের সঙ্গে আর কোথাও আমি মহান জাপানের কথা উল্লেখ করতে পারব না।"

সেদিন পরাধীন ভারত ক্ষতবিক্ষত চীনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চীনের যুদ্ধাহতদের সেবায় ১৯৩৯ সালে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে পাঠানো হয়েছিল মেডিকেল মিশন। শ্রীজওহরলাল নেহরু সেদিন বলেছিলেন, এই মিশন প্রমাণ করবে যে, ক্ষমতার রাজনীতিতে ভারত সামান্য হলেও সে চায় শক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়।

কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনে চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে তার প্রতিশোধ সংগ্রামে সমর্থন জানানো হয়েছে। বারবার পালিত হয়েছে 'চীন-দিবস'। ১৯৩৭ সালে কম্যুনিস্ট চীনের অন্যতম প্রধান জেনারেল চু-তে সুভাষচন্দ্রের কাছে সাহায্যের জন্য যে চিঠি লেখেন, তারই প্রত্যুত্তরে সারা ভারত ১৯৩৮ সালের ৯ই জানুয়ারি দ্বিতীয় বার 'চীন-দিবস' পালন করে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে শ্রীনেহরু যান চীন সফরে।

তারই কিছু দিন পর ১৯৪২ সালে রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইশেক সস্ত্রীক আসেন ভারতবর্ষে। শান্তিনিকেতনে তিনি যান এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা হয় গবেষণাকেন্দ্র 'চীন-ভবন।' আজও সেখানে অনলস গবেষকের দল দুই মহান দেশের মধ্যে সংস্কৃতির সম্পর্ক গড়ে তুলছেন একের পর এক গবেষণাচর্চার মারফতে। ১৯৪৯ সালে চীনে যখন কম্যুনিস্ট শাসন কায়েম হয়, তখনও তাকে ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। শত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কম্যুনিস্ট চীনের সদস্যপদ গ্রহণের জন্যে ভারত দাবির পর দাবি জানিয়ে আসছে।

এই সদ্ভাবের পরিণতিতে ১৯৫৪ সালে কম্যুনিস্ট প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই এলেন ভারত দর্শনে। দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইস্তাহারে প্রথম উদ্গীত হল 'পঞ্চশীল'। ওই একই বছর অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গেলেন চীনদেশে। তারপর আরও দু'বার চু-এন-লাই এলেন ভারতে। কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর ভারত-প্রীতি লক্ষ্য করে। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে তখন একমাত্র ধ্বনি 'হিন্দি-চীনি-ভাই-ভাই'।

কিন্তু কে জানত এই কম্যুনিস্ট চীনই ভেতরে ভেতরে ভারতের বুকে ছুরি মারছে! বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি!

বছর বার আগে কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে যখন ভারতের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হল, তখন থেকে এই কথাটাই বারবার স্মরণ করা হয়েছে যে, এই ত্বটি বৃহৎ প্রতিবেশীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ত্ব হাজার বছরের ; আশা করা হয়েছে, নতুন বিশ্বপরিস্থিতিতে এই সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে উঠবে।

অথচ পাঁচটি বছরও কাটল না, সেই আশা ব্যর্থ হল। ভারতের মৈত্রী আর বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত হানল চীনা কর্তৃপক্ষ। আজ এই আঘাতে উত্তর সীমান্তের শাশ্বত প্রহরী নগাধিরাজ হিমালয় কেঁপে উঠেছে। এতদিন যা সীমান্ত সংকট ছিল, আজ তা বৈদেশিক অভিযান। চেঙ্গিস খাঁ তৈমুর লঙের বর্বরতার পুনরাবৃত্তি। চীনা সৈন্যের পদভারে ভারতভূমি কলঙ্কিত।

লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ক্রুর উল্লাসে, কামান-ট্যাঙ্কের হিংস্র গর্জনে কম্যুনিস্ট চীন আজ ভারতের বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আর ভারত? ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অকম্যুনিস্ট জগতে ভারতই সর্বাগ্রে তাকে স্বীকৃতি দেয়। নেহরু তখন বলেছিলেন,—"যে পরিবর্তন আজ ঘটল, তাকে স্বীকার বা অস্বীকারের প্রশ্ন নয়, ইতিহাসের এক বড় ঘটনাকে মেনে নেওয়াই আসল কথা।"

তারপরের ঘটনা দ্রুত। ১৯৫০ সালে তিব্বতী মিশনের পিকিং যেতে দেরি হওয়ায় চীনা সৈন্যকে যখন পূর্ব তিব্বতের দিকে এগিয়ে যেতে আদেশ দেওয়া হয়, ভারত সরকার তখন বিস্ময় ও ত্বঃখ প্রকাশ করেছিলেন। চীন সরকারকে একখানা চিঠিও লেখেন এবং সেই প্রথম এক অসৌজন্যমূলক অভদ্র জবাব দিয়ে ভারত-সরকারকে চীন জানায়, তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে ভারত যেন মাথা না ঘামায়।

অবশেষে ভারত তিব্বতের ওপর চীনের কর্তৃত্ব মেনে নিলেন।

এবং বলা যেতে পারে ভেতরে ভেতরে অসদ্ভাবের শুরু এই পর্ব থেকেই।

কিছুকাল পর এল কোরিয়ার ঘটনা। ভারত তখনও কম্যুনিষ্ট চীনের ধ্বজাধারী। ১৯৫১ সালে সানফ্রানসিসকোয় জাপানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সম্মেলনে ভারত যোগ দেয় না। কারণ হিসেবে বলে চীনকে ফরমোজা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা এই চুক্তিতে নেই।

ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দিয়েন-বিয়েন-ফু'তে বিধ্বস্ত হবার পর এই যুদ্ধ যখন বিশ্বব্যাপী রূপ নিতে চলেছিল, সেই সময় আবার চীনের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৯৫৪ সালে ভারতের উদ্যোগে জেনিভাতে ইন্দোচীন সম্পর্কে যে সম্মেলন হয়, চীন তাতে যোগ দিয়েছিল। চুক্তিও তার মনঃপূত হয়েছিল। তার পরেই চু-এন-লাই এলেন ভারতে। স্বাক্ষরিত হল 'পঞ্চশীল'। পর বছর বসল বান্দুং সম্মেলন,—তারও প্রধান উদ্গাতা ভারত। আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে এই ভারতই সেই সম্মেলনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কম্যুনিস্ট চীনকে।

চীনের সঙ্গে মিত্রতায় ভারতের মনে কোন খাদ ছিল না। ভারত চীনের বাহ্যিক সদিচ্ছায় বিশ্বাস করেছিল। তিব্বতে চীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে এবং তিব্বতে বৃটিশ ভারতের কাছ' থেকে পাওয়া বিশেষ অধিকারগুলো পরিত্যাগ করে ভারত যখন চীনের সঙ্গে চুক্তি করল, তখনও সে পরম বিশ্বাসে সীমান্ত সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রয়োজন মনে করেনি।

চীনের নেতারা সে বিশ্বাসে সমর্থন জানিয়েছেন। সীমান্তের চল্লিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা চীনের বলে চিহ্নিত মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা বলেছিলেন, এ মানচিত্র পুরনো, তার সংশোধন করা হবে। এদিকে চীনা সৈন্য সাজ সাজ রবে সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে বসছে।

১৯৫৪ সালের ১৭ই জুলাই উত্তর প্রদেশের বড়হোতি নামক জায়গায় ভারতীয় সৈন্যের অবস্থিতির বিরুদ্ধে চীন সরকার প্রতিবাদ

করে বসল। তার আগে তারা ভারতের কোন এলাকার ওপরই দাবি জানায়নি ; বরং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভারতের অখণ্ডতা তারা কখনও লঙ্ঘন করবে না। ভারতের ধারণা হল, বোধ হয় এই ঘটনা অজ্ঞতাপ্রসূত।

সে বছরই অক্টোবর মাসে শ্রীনেহরু গেলেন চীনে। ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল চীনের অন্তর্গত দেখিয়ে চীন যে সব মানচিত্র ছাপিয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র চীনা নেতারা বললেন, এগুলো কুওমিণ্টাং আমলের, সুতরাং তার কোন গুরুত্ব নেই।

এল ১৯৫৫ সাল। বড়হোতিতে এক দল চীনা অনধিকার ঢুকে পড়ল। ভারত সরকারের প্রতিবাদ ব্যর্থ হল। কিছুদিনের মধ্যে উত্তর প্রদেশের দমজান এলাকায় ভারতের দশ মাইল ভেতরে আর একদল চীনা এসে গেল এবং তারপরেই দাবি করে বসল বড়হোতি। সিপকি গিরিপথ দিয়ে চলল তাদের গোপন যাওয়া আসা।

চু-এন-লাই এলেন ভারতে, তিনি বললেন, উত্তর পূর্ব সীমান্তে ম্যাকমেহন লাইন তিনি মেনে নেবেন। কিন্তু এদিকে উত্তর পূর্ব কাশ্মীরের আকসাই চীন এলাকার মধ্যে চীন একটি সামরিক রাস্তা তৈরী করে ফেলেছে। এই রাস্তা যুক্ত করেছে গার্তোক আর ইয়ারখন্দকে। জনশূন্য ১৭ হাজার ফুট উঁচুতে এই রাস্তা তৈরীর কথা ভারত সরকার তখন জানতেন না। ১৯৫৮ সালে একটি ভারতীয় দল এই সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে চীনাদের হাতে বন্দী হন। ভারতের প্রতিবাদের উত্তরে উদ্ধত চীন জানায়, এ এলাকা নাকি তাদের।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিব্বতে খাম্পা-বিদ্রোহ। স্বৈরাচারী কম্যুনিস্টদের অত্যাচারে নিপীড়িত তিব্বতী জনসাধারণ রুখে দাঁড়াল। কিন্তু সব ব্যর্থ হল, সামরিক শক্তিতে অধিক বলশালী নির্দয় চীন প্রচণ্ড আঘাতে সেই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভেঙে দিল।

১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে দলাই লামা তওয়াং বমডিলার পথ ধরে পালিয়ে এলেন ভারতে। সদলবলে। ভারত তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিল।

দলাই লামাকে হত্যা করতে না পারার আক্রোশে চীন আবার শুরু করল তীব্র ভারত-বিদ্বেষ অভিযান। এবং চিরাচরিত সীমান্তের কোন মর্যাদা না দিয়ে নে-ফার সুবর্ণশ্রী ডিভিশনের ভেতর অনধিকার ঢুকে পড়ে প্রচণ্ড গুলী চালাল, ১৯৫৯ সালের ২৫ আগস্ট দখল করে বসল ভারতের লংজু। লোহিত ডিভিশনের ওয়ালঙে চলল গুলীবর্ষণ, দখল করল লাদখের ১২ হাজার বর্গ-মাইল।

না, তাতেও ধূর্ত, ক্ষুধার্ত ড্রাগনের তৃপ্তি নেই। ওই বছরই ২০শে অক্টোবর মারমুখী চীনা সৈন্য ভারতীয় এলাকার ৪০ মাইল ভেতরে ঢুকে লাদখের কোংকা গিরিপথের কাছে হিংস্র পশুর মত নয়জন নিরীহ ভারতীয়কে হত্যা করে। আরও দশজনকে বন্দী করে নিয়ে চালায় অমানুষিক অত্যাচার।

সীমান্ত সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ল। ভারতের লোক-সভায়, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে চীনের দুরভিসন্ধি আর ভারতের অহেতুক ভালোমানুষীর সমালোচনা সারা দেশে ঝড় তুলল। ১৯৬০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আবার দিল্লীতে এলেন চু-এন-লাই। আলোচনা ব্যর্থ হল। শুধু ঠিক হল আরও আলোচনার জন্যে দু দেশের পদস্থ কর্মচারী বৈঠকে মিলবেন।

চীন কিন্তু ওদিকে নীরব নয়। কালিম্পঙের কাছে জেলেপ গিরিপথে চীনা টহলদার সিকিমে বারবার ঢুকছে। ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার দু দেশের কর্মচারীদের আলোচনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন, তাতে প্রমাণিত হল ভারতের দাবি। চীন সরকার দীর্ঘকাল এই রিপোর্ট চেপে ১৯৬২ সালের মে মাসে চীনা অংশের কিছুটা মাত্র প্রকাশ করল।

পূর্ব সীমান্ত তখন কিছুটা শান্ত; কিন্তু ওই পারে রাস্তার পর

রাস্তা তৈরি হচ্ছে, ডিভিশনের পর ডিভিশন চীনা সৈন্য মোতায়েন হচ্ছে, বিমান ঘাঁটি রাতারাতি গড়ে উঠছে। এবং পশ্চিম সীমান্তের অশান্তি কিছুতেই থামছে না। ভারত সরকার যত প্রস্তাব নিয়ে আসছেন, চীনের অনমনীয়তা এবং জেদ ততই বেড়েই চলেছে।

শুধু তাই নয়, ১৯৬২ সালের ৩রা মে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং চীনের মধ্যে "সীমানা" চিহ্নিত করায় পাক-চীনি একটা যৌথ উদ্যোগও শুরু হল। নেপালের রাজা মহেন্দ্র কম্যুনিস্ট চীনের উসকানিতে ভারত বিদ্বেষ প্রচারের জেহাদ ঘোষণা করলেন।

বিচিত্র এই ইতিহাস। তথাকথিত সমাজবাদী চীন গণতন্ত্রী ভারতকে পর্যুদস্ত করার প্রতিজ্ঞায় রাজতন্ত্রী নেপাল এবং কম্যুনিস্ট বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে কসুর করল না। চীন নেপালে পাঠাল স্বেচ্ছাসৈন্য, তারা ভিড় জমাল ভারত সীমান্তে। আর পাকিস্তান হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঘাঁটি গাড়ল ভারতের সীমান্তে। তারই ফাঁকে লাদখের চিপচাপ উপত্যকা এবং প্যাংগং হ্রদ এলাকায় ভারতীয় সীমান্ত-রক্ষীদের ওপর শুরু হল রণদুর্মদ চীনের অশ্রান্ত গুলীবর্ষণ।

ঘটনার অবনতির কাহিনী এইখানেই শেষ নয়, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর আবার হঠাৎ চীনের ত্রিশূল অভিযান। চীনা সৈন্য তিব্বত, ভূটান ও নে-ফার সংযোগস্থলে ভারতীয় ঘাঁটি ঢোলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী জওয়ানের দল মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষার মহানব্রতে পালটা গুলী চালাল। তাদের অনেকে তুষারাচ্ছাদিত নির্জন গিরিকন্দরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল, কেউ আক্রমণকারী চীনা সৈন্যের পৈশাচিক উল্লাসের যোগ্য উত্তর রাইফেলের ট্রিগারে জানাল।

এতদিন তাই চলছিল। চীনের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকায় ক্ষুব্ধ আহত নেহরু বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন, জওয়ানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চীনাদের হঠাতে। উত্তরের আকাশে মেঘ আরও কালো হয়ে কুণ্ডলী পাকাল।

আসামের উত্তরে বিস্তৃত অঞ্চল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি—সংক্ষেপে নে-ফা। তার ভেতরে রয়েছে পাঁচটি ডিভিশন—কামেং, সুবর্ণশ্রী, সিয়াং, লোহিত, তিরাপ। অরণ্যের নিভৃত আলয়ে এখানকার বাসিন্দা, আবর, দাফলা, মোনপা, মিশমি, আপা তানিস, শেরডুকপেন প্রভৃতি উপজাতি।

ভারত সরকারের চেষ্টায় খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর ভেরিয়ার এলউইনের পরামর্শে এই নেফা এলাকা নতুনরূপে গড়ে উঠতে থাকে। অরণ্যচারী উপজাতির দল সভ্যতার আলোকের ছোঁয়া পেয়ে আদিম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। বমডিলা, জিরো, আলং, তেজু এবং খোন্‌সাকে সদর দপ্তর করে ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত এই পাঁচটি ডিভিশন ধাপে ধাপে এগোতে থাকে। কিন্তু বিধি বাম, কামানের গোলায় আর হানাদারের দৌরাত্ম্যে সব ধাঁধা লেগে গেল। ছোটখাট ধাঁধা নয়, 'চৈনিক ধাঁধা'।

তিব্বত আর চীনের কোল ঘেঁষে ম্যাকমেহন লাইন। দুই রাষ্ট্রের চিরাচরিত সীমারেখা।

যে ম্যাকমেহন লাইনকে কেন্দ্র করে সীমান্তে চীনের হানা, তার স্রষ্টা হলেন পাঞ্জাবের এক ভূতপূর্ব কমিশনারের তনয়—জেনারেল স্যার আর্থার হেনরি ম্যাকমেহন। তাঁর জন্ম আজ থেকে এক শ বছর আগে, ১৮৬২ সালের ১৮ই নবেম্বর, সিমলাতে। মৃত্যু ১৯৪৯ সালে, লণ্ডনে।

এই ম্যাকমেহন লাইন সৃষ্টির ইতিহাস এক যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। চীন-তিব্বত যুদ্ধ। ১৯১০ সালে ক্ষুধার জ্বালায় পররাজ্য গ্রাসের লোভে হাজার হাজার চীনা তিব্বতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর দৃষ্টি পড়ে ভারতের দিকে। ব্রিটিশ সরকার তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে ভারত-চীন-তিব্বতের সীমান্তে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ম্যাকমেহন তখন বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারি। তাঁর ওপরই পড়ে সীমানা টানার ভার। ১৯১৩-১৪ সালে ম্যাকমেহন মাত্র

২৫ জন কর্মচারী নিয়ে এই তুরূহ কার্য সমাধা করেন। তিন রাষ্ট্র বরাবর এই সীমারেখার মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

চীন কখনও বলে, "এই লাইন আমি মানি না", কখনও বলে, "আচ্ছা মানতে রাজী আছি।" ভারত কিন্তু বরাবর বলে এসেছে, "এই চিরাচরিত লাইন নিয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে, এসো, আলোচনায় বসি।" চীন তাতে কান দেয় নি। ছলে বলে কৌশলে সে ভারতভূমি গ্রাস করবেই।

সর্বশেষে এই সাম্প্রতিক অভিযানেই চূড়ান্ত। সমাজবাদীর মিথ্যে খোলস এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর চীন আমাদের ঘাঁটি খিনজেমানে এবং ঢোলা কেড়ে নিল। নির্লজ্জ অট্টহাসি হেসে এগিয়ে চলল আর একটি ভারতীয় ঘাঁটির দিকে। থাগলা টিলা পার হয়ে নামকা নদী অতিক্রম করে হাজার হাজার চীনা দস্যু তুর্বার বেগে পিপীলিকা পালের মত গোটা এলাকা ছেয়ে ফেলল। এবং সেই তুঃসংবাদই নিয়ে এল আকাশবাণীর বেতার-ভাষণ।

তার পরের ঘটনা দ্রুত। পরদিনের সংবাদ হানাদারদের আরও অগ্রগতি। বীর ভারতীয় জওয়ানের দল চীনের বিপুল সৈন্যবল আর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার না করে পিছু হটে এসেছে। যে যুদ্ধবাজ দস্যু, যে আক্রমণকারী, যে যুদ্ধের জন্যে বরাবর প্রস্তুত, তার কাছে শান্তিকামী ভারতের অপ্রস্তুত ও মুষ্টিমেয় সীমান্তরক্ষীর শক্তি কতটুকু!

বিষণ্ণ মন নিয়ে গ্যাংটক ছাড়লাম। শিলিগুড়ি পথেই খবর এল মঠনগরী তাওয়াং হানাদারদের হাতে। তাওয়াং থেকে জং বমডিলা রূপা, ফুটহিলস হয়ে তেজপুর মাত্র তু'শ মাইল,—আকাশ-পথে আদ্ধেক। এদিকে ভূটানও বিপন্ন।

আর এখানে নয়, সংবাদ এখন নে-ফায়, আর লাদখে।

ম্যাকমেহন লাইনের কোল ঘেঁষে ভূটান আর নে-ফার গায়ে লাগা দুটি অখ্যাত নাম ঢোলা এবং খিনজেমানে। লাইন অতিক্রমকারী চীনা সৈন্য ঢোলা থেকে খিনজেমানে পর্যন্ত দশ মাইল ব্যাপী জায়গায় রণাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। কুখ্যাত কোরিয়া যুদ্ধের কায়দা অনুসরণ করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলশালী চীন প্রচণ্ড বিক্রমে ভারতভূমি গ্রাস করতে এসেছে।

শুধু নে-ফা নয়, ২০শে অক্টোবর ভোর ৫টা থেকে যুগপৎ আক্রমণ চলেছে লাদখে, চিপচাপ উপত্যকায়। আমাদের কয়েকটি ছোটখাট ঘাঁটিও হস্তচ্যুত।

নে-ফার থাগ-লা পাহাড় ১৭ হাজার ফুট উঁচু। পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে ৯,৬০০ ফুট খিনজেমানের দিকে। কাছেই দুটি নদী নামকা আর নামজং। এই নদীর উপত্যকার পথ ধরে চীনারা এসেছে। ভারী মর্টার আর মাঝারি মেসিনগানের অনল বর্ষণে বিপর্যস্ত মুষ্টিমেয় ভারতীয় জওয়ান প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। খিনজেমানে ঘাঁটি দখল করে চীন সৈন্য নামকা নদী বরাবর এগিয়ে ঢোলাও জবরদখল করেছে।

ঢোলা ঘাঁটি পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় বীরের দল প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে মরণপণ সংগ্রাম চালায়; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আর শত্রুপক্ষের অপরিমিত সৈন্যবলের কাছে দাঁড়াতে পারেনি।

পরদিন ২১শে অক্টোবরও প্রচণ্ড লড়াই চলে। হানাদারের দল নামকা নদীর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়। লাদখ এলাকায় আরও দুটি ঘাঁটি চীনারা দখল করে এবং আর একটি ভারতীয় হেলিকপটার নিখোঁজ হয়ে যায়। নে-ফা এলাকায় যে ভারতীয় ঘাঁটি শত্রুকবলিত হয় তার নাম সাংলা।

আক্রমণের তীব্রতা বেশী লাদখের গালোয়ান এবং পাংগং হ্রদ এলাকায়। ভারত গালোয়ানের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে।

২২শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নেহরু আবেগজড়িত কণ্ঠে

মিথ্যাবাদী চীনের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন, "পরিণামে আমাদের জয় অনিবার্য, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার রক্ষা করা হবেই হবে।"

তাঁর মতে "চীনের এই আক্রমণ স্বাধীনতার পর ভারতের চরমতম সংকট।" এই সংকটের মুখে "ন্যায়নীতি বিগর্হিত ও নির্লজ্জ চীন আক্রমণের" প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

তাঁর এই আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দেয়, চীনাপন্থী একদল দেশদ্রোহী কম্যুনিস্ট ছাড়া সবাই জড়ো হয় জাতীয় পতাকার তলে। অর্থ, অলঙ্কার, সাহস, শক্তি সব নিয়ে তারা দাঁড়ায় রাষ্ট্রের বিপদে।

কিন্তু ওদিকে হানাদারদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলে। লাদখ রণাঙ্গনে হানাদারবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে অবতীর্ণ হয়. নে-ফার লংজুতে, কিবিটোতে। ঘাঁটির পর ঘাঁটি হস্তচ্যুত হয়। চীনা দস্যুরা ঢোলার আধ মাইল দক্ষিণে সেংধারের ওপরেও নেমে পড়ে। ভারতীয় জওয়ানরা এই ঘাঁটিও ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। লাদখে দৌলতবেগ ওলদি ঘাঁটির অবস্থাও সঙ্গীন।

অবশেষে মঠনগরী তাওয়াং। চীনা হানাদারদের হিংস্র বাহু ততক্ষণে আরও বিস্তৃত, থাবা আরও প্রসারিত। ম্যাকমেহন লাইনে দশ বার মাইল ভেতরে ওরা চলে এসেছে, মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্যকে গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

দেখা গেল তাওয়াং দুদিক থেকে আক্রান্ত। এবং আরও দেখা গেল মধ্য নে-ফায় সুবর্ণশ্রী ডিভিশনের আসাফিলায় চীনারা নতুন ফ্রন্ট তৈরী করেছে। কামেংয়ের বুমলা, লুম্পুও যায় যায়।

পুরো দুদিন তুমুল লড়াইয়ের পর তাওয়াং চলে গেল চীনা-দস্যুর কবলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড প্রতিরোধের পর আমাদের জওয়ানরা পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী তাওয়াং ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সারা ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধমঠ এই তাওয়াং পল্লীতে এবং চীন অধিকৃত ভারতভূমির মধ্যে এইটিই একমাত্র জনবসতিবহুল এলাকা।

শুধু তাওয়াং নয়, সিয়াং ও লোহিত ডিভিশনে এবং লাদখের গালোয়ান উপত্যকার দামচক এলাকায় তখনও ভারতীয় ঘাঁটির অবস্থা কাহিল, কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত।

তাওয়াংয়ের পতনের পরদিন, ২৬শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন ঘোষণা করলেন 'জাতীয় সঙ্কট।' বলবৎ হল 'ভারতরক্ষা অর্ডিন্যান্স।' ভারতভূমি গ্রাসে উদ্যত চীনা অভিযান প্রতিরোধে ভারত-সরকারের কঠোরতর ব্যবস্থার এই হল প্রথম পর্যায়।

এবং রণাঙ্গনেও বহু চীনা সৈন্য নিহত করে নে-ফায় ও লাদখে ভারতীয় জওয়ানরা এবারে শুরু করল পালটা মারের খেলা। যেমন করেই হোক, চীনা অগ্রগতি বন্ধ করতে হবে, হৃত ভারতভূমি উদ্ধার করতে হবে। তাওয়াংই শেষ, আর নয়।

পুরো এক সপ্তাহ ভাগ্যবিপর্যয়ের পর যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল ২৭শে অক্টোবর থেকে। লাদখে, নে-ফায় আমাদের জওয়ানরা চীনা সৈন্যদের ঘায়েল করতে শুরু করল। এতদিন অপ্রস্তুত থাকার পর আমরা নতুন সৈন্য আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালটা আঘাত হানতে তখন তৈরি।

তাওয়াং থেকে চীনারা এসেছে জং। তারপরেই লক্ষ্য বমডিলা। নববলে বলীয়ান ভারতীয় সৈন্য পথ রুখে দাঁড়াল। আর যেতে দেবে না। এইখানেই চলছে লড়াই।

ইতিমধ্যে সরকারী হিসেবমতেই প্রায় আড়াই হাজার দুঃসাহসী জওয়ান রণাঙ্গণে প্রাণ দিয়েছে। চীনা সৈন্য মরেছে তার চার গুণ।

চীনা সেনাপতি চ্যাং চ্যাং কুয়োহুয়া প্রতি চীনা সৈন্যের জন্যে দশটি করে ভারতীয় সৈন্যের মাথা চেয়েছিলেন, ওয়ালংয়ের কাছে

একজন ভারতীয় ননকমিশন্ড্ অফিসার শেষ শয্যা পাতার আগে তার যোগ্য জবাব দিয়েছেন। এই বীর সন্তান ভারতীয় ঘাঁটির কাছে অস্ত্র হাতে পরিখা থেকে লাফ দিয়ে আটজন চীনা দস্যুকে খতম করে লুটিয়ে পড়েছেন রক্তাক্ত মাটিতে।

রক্তসিক্ত রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের আর একটি অমর কাহিনী ইতিমধ্যে ঘটে গেছে লাদখে। দক্ষিণ লাদখের প্যাংগং হ্রদ এলাকায় দুইটি ঘাঁটিতে ২০শে অক্টোবর সকালে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়, নিকটের চীনা ঘাঁটিতেও কোন পরিবর্তন ছিল না। কিন্তু কুয়াশাজাল ছিন্ন হতে না হতেই ভারতের দুটি ঘাঁটির গায়ে হঠাৎ শত্রুর প্রবল গুলীবর্ষণ।

ভারতীয় ঘাঁটির অধিনায়ক মেজর দানসিং থাপা। সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হলেন। অগ্রগামী চীনারা বুলেটের আঘাতে নিহত হল ১০০ জন।

এবারে চীনারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্যাঙ্কের সারি নিয়ে। দখল করে ফেলল এই ছোট ভারতীয় ঘাঁটি। দ্বিতীয় ঘাঁটি দখল করতে না পেরে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে। আমাদের জওয়ানদের মধ্যে ২জন ছাড়া সবাই বীরের মৃত্যু বরণ করে।

যে দুজনের মৃত্যু হয়নি, তাঁরা ধ্বংসস্তূপের নীচে ছিলেন। কানক্রমে নিজেদের উদ্ধার করে তাঁরা পেছনের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে এসে যোগ দিলেন।

এই ঘাঁটির অনতিদূরে ছোট পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি কোনক্রমে বেঁচে যায়। এবং এইখানে বসে মেজর থাপার নেতৃত্বে পাঁচ জন জওয়ান প্রবল প্রতিরোধে ঘাঁটি আঁকড়ে থাকে, দস্যু-কবলিত হতে দেয় না। রাত্রির অন্ধকারে তারা নীচের হ্রদের নিকটে নেমে আসে এবং ওখানেই উদ্ধারকারীর দল তাদের দেখতে পায়। শত্রুর গুলীবর্ষণ অগ্রাহ্য করে এই দল কয়েকখানি নৌকো যোগাড় করে অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে নিয়ে আসে এবং জওয়ান দু'জন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একের পর এক এই প্রতিরোধ সংগ্রামে, পাল্টা আঘাতে দেশবাসীর মনে বল ফিরে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য থেকে আসতে শুরু করে আধুনিক সমরাস্ত্র। মিত্র রাষ্ট্রের দল চীন আক্রমণের নিন্দা করে বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত, কলকাতায় বাঙ্গালোরে জব্বলপুরে যে সকল সৈন্য মোতায়েন ছিল তারাও ছুটে যায় রণাঙ্গনে। সেনাধ্যক্ষ জেনারেল থাপার এক বিশেষ হুকুমনামায় জওয়ানদের অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করেন —'সকল রণাঙ্গনে শত্রু প্রতিহত।'

এদিকে নে-ফার লাগোয়া আসামের তেজপুর ডিব্রুগড় জোড়হাটে চাঞ্চল্যের আর উদ্দীপনার সীমা নেই। ভারতীয় জেট ফাইটার 'তুফানী' যখন আকাশে টহল দিয়ে বেড়ায়, মিলিটারি গাড়ি যখন দ্রুতবেগে জঙ্গলে ঢুকে যায়, বেসামরিক জনসাধারণ দু হাত তুলে শুভেচ্ছা জানায়, চীৎকার করে বলে "জয় হিন্দ"।"

এই উদ্দীপনা শুধু রণাঙ্গন সংলগ্ন আসামে নয়, কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী মাদ্রাজ,—ভারতের সর্বত্র।

কলকাতায় ফিরে দেখি চারদিকে উদ্দীপনার ঢেউ, এক নূতন অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। সবার মুখে একটিমাত্র কথা—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।'

চীন দরদী একদল কম্যুনিস্ট ছাড়া সবাই চীনকে ঘোষণা করেছে আক্রমণকারী। ময়দানে ডাকা হয়েছে সর্বদলীয় জনসভা। প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা হতে লাগল ধনীনির্ধনের সঞ্চয়। এক নয়া পয়সা থেকে লক্ষ কোটি টাকা। কেউ দিচ্ছে সারা মাসের রোজগার, কেউ দিচ্ছে দিনের।

আর জমা হচ্ছে সোনার অলঙ্কার। বহু স্মৃতিবিজড়িত, গয়নার পর গয়না বাক্স থেকে, শরীর থেকে খুলে তুলে দিয়ে আসছে সংগ্রামী সেনাদলের সাহায্যে। ব্লাড ব্যাঙ্কে ভিড় জমে গেছে আহত জওয়ানদের জন্যে রক্ত দিতে। মন্ত্রী উপমন্ত্রী কেরানী

দোকানদার কেউ বাদ যায় নি। কালী পূজার উৎসব ম্লান, ভাইফোঁটা ম্লান।

সেনা সংগ্রহকেন্দ্রে ভিড় আর ভিড়। লড়াই করতে যুবকের দল আগুয়ান। হোমগার্ডে নাম লেখাবার জন্যে লাইনের পর লাইন। এমন উদ্দীপনা স্বাধীন ভারতে আর কেউ দেখে নি। এই প্রথম মনে হল—'জাগে নব ভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা।'

নয়াদিল্লীতে বসছে ঘন ঘন বৈঠক। লোকসভার অধিবেশন এগিয়ে আনা হল। মিত্ররাষ্ট্র থেকে আসতে লাগল সাহায্য। জনসাধারণের চাপে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে বিদায় নিতে হল শ্রীকৃষ্ণ মেননকে। নেহরুই নিলেন সে ভার। জনসাধারণের অভিযোগ, চীনের কপটতার ফাঁদে মেনন ধরা পড়েছেন, সময়ে কেন তিনি প্রস্তুত হননি, কেন তিনি সীমান্তরক্ষার আরও ভাল ব্যবস্থা এতদিন করেননি ?

রাজধানী দিল্লিতে বিদেশী দূতের আনাগোনার বিরাম নেই। আসছে নানারকম প্রস্তাব, ইতিমধ্যে খল চীন জানাল, এখনকার অবস্থা বজায় রেখে সে আলোচনা করতে রাজী। ভারত ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ঢের শিক্ষা হয়েছে, আর সে ছলনার ফাঁদে ধরা পড়তে রাজী নয়।

মধ্যস্থতা আর সালিশীর দাবি নিয়েও এল অনেক রাষ্ট্র। সিংহল, মিশর, লাইবেরিয়া। ভারতের একমাত্র উত্তর : ভারত-ভূমি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আক্রমণকারী চীনের সঙ্গে কোন আলোচনায়, কারও মধ্যস্থতায় রাজী নই। আগে হটে যাও, তারপর বাতচিত। সাফ কথা।

ওদিকে তখনও যুদ্ধ চলছে। পালটা আক্রমণ আরও জোরদার।

কিন্তু চীন কেন আক্রমণ করল ? সরল বিশ্বাসীদের মনে এখনও সেই প্রশ্ন। সীমান্ত সফরের অভিজ্ঞতায় এবং সাংবাদিকের

ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি এই কথা বুঝেছি, এই আক্রমণ অতর্কিত নয়, শুধু সীমানার লড়াই নয়, ভারতের চরম সর্বনাশ সাধনের জন্যেই কম্যুনিস্ট চীন, তথাকথিত "সমাজবাদী চীন" দীর্ঘকাল ধরে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের দুরাকাঙ্ক্ষায় কল্যাণরাষ্ট্র ভারতকে প্রবল প্রতিপক্ষ ভেবে চীন এই আঘাত হেনেছে। সে চায় না ভারতের তৃতীয় পাঁচশালা যোজনাগুলি সফল হোক, তার জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবে রূপ নিক। সে চায় না ভারতে গণতন্ত্র চিরস্থায়ী হোক, তার জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বিশ্বের আদর্শস্থল হোক। রুশদেশের সঙ্গে ভারতের ইদানীংকার মধুর সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে রুশদেশের মতান্তরের পটভূমিকায় ঈর্ষার বিষয়। তাই ভারতকে যেনতেনপ্রকারেণ পশ্চিমীগোষ্ঠীতে ঠেলে দিতে হবে।

তদুপরি আছে মহাচীনের ভেতরে বুভুক্ষার জ্বালা, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। কল্যাণমূলক পরিকল্পনার অভাবে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতায় চীনের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার, ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়। এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষকে ভোলাবার জন্যে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনায়কদের জিইয়ে রাখতে হবে সীমান্ত বিরোধ। তাদের দৃষ্টি টেনে নিয়ে যেতে হবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার প্রচারে। প্রায় ৭০ কোটি মানুষের ভারে ক্লিষ্ট দেশকে যুদ্ধের তাণ্ডবে মাতিয়ে জনভার কমাতে হবে।

সর্বোপরি আছে সম্প্রসারণবাদের দীক্ষা, পররাজ্য লিপ্সার আকাঙ্ক্ষা। অর্থনীতিতে আর উন্নয়নে ক্রম-বলীয়ান ভারত চীনের কাছে তাই চক্ষুশূল। প্রতিবেশী ভারত যদি তার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে পাঁচসালা যোজনার নানা প্রকল্পে চরম উন্নতির পথে নিয়ে যায়, জোটনিরপেক্ষতা বজায় রেখে এশিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে জনভার পীড়িত, ক্ষুধায় কাতর, অগণতন্ত্রী অনগ্রসর চীনের ভবিষ্যৎ যে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে দিশেহারা কম্যুনিস্ট নেতারা তাই বুঝি ভারতের বুকে আঘাত হানতে এত বদ্ধপরিকর।

জানি না আমার এই বিশ্লেষণ পুরোপুরি সঠিক কিনা; কিন্তু একথা জানি চীনের ভূমিক্ষুধা চিরন্তন। সাড়ে পনেরো লক্ষ বর্গমাইলের একদা মাঝারি চীন মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং আর তিব্বত গ্রাস করে আজ হয়েছে তেতাল্লিশ লক্ষ বর্গমাইলের 'মহাচীন'। এবং অবশেষে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তের আরও পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল গ্রাস করতে সে উদ্যত।

একথা চীন ভাল করেই জানে কম্যুনিজমের প্রবল প্রতিপক্ষ গণতন্ত্র। যেখানে গণতন্ত্র স্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছে, সেখানে কম্যুনিজমের অস্তিত্ব আর থাকতে পারে না। কম্যুনিজম বিস্তারের এই উদগ্র কামনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চীনের ভয়ংকর খাদ্যসমস্যা। আর অবিশ্বাস্য হারে লোকবৃদ্ধি। পর পর অজন্মার পর তাকে হাত পাততে হয়েছে 'বুর্জোয়া' দেশগুলোর কাছে। যুদ্ধে কয়েক কোটি মানুষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছাড়া তার বোধ হয় আর গত্যন্তর নেই। এবং তাই আজ সে এত জঙ্গী।

১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে চীনে বাইরে থেকে খাবার এসেছে এক কোটি দশ লক্ষ টন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা পায়নি, সব মজুত রাখা হয়েছে সৈন্যবাহিনীর জন্যে। চীনের হৃষ্টপুষ্ট পঁচিশ লক্ষ সৈন্য দেখে বোঝার উপায় নেই, জনসাধারণের চেহারা কত অনাহারক্লিষ্ট।

সাধারণ মানুষ আজ সেখানে ক্রীতদাস। ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজ নয়, 'সবার ওপরে রাষ্ট্র সত্য, তাহার উপরে নাই।'

এই রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে শত শত জীবন। নয়া নয়া কানুনে সেখানে বিভীষিকার রাজত্ব এবং এই বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ আত্মহত্যা। ১৯৫০ সালে বিবাহ আইন

জারী হবার ছয় মাসের মধ্যে একমাত্র মেয়েরাই আত্মহত্যা করেছে ১০ হাজার জন। অন্যেরা তো রয়েছেই।

চারদিক থেকেই তাই লাল চীনের আজ সঙ্কট। রুশদেশের অসহযোগিতায় তার অনেক প্রকল্পের কাজ বন্ধ, ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন উপেক্ষিত, ফসলের দুরবস্থা, সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের জন্যে পশ্চিমী দেশের কাছে পর্বতপ্রমাণ ঋণ। কম্যুনিস্ট জঙ্গী নেতাদের মতে এই দেউলে অবস্থার একমাত্র প্রতিকার রণহুঙ্কার এবং এই হুঙ্কার দিয়েই তাঁরা লাখ লাখ চীনা সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছেন ভারত-ভূমি গ্রাসের উৎকট বাসনায়। তাদের মারণাস্ত্রের আঘাতে ভারতের পুণ্যভূমি আজ রক্তাক্ত।

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জঙ্গীবাজ চীন অচিরেই তার ভুল বুঝতে পারবে। অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলিয়ে সারা ভারত দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। একবিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সে লালচীনের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। হৃতভূমি পুনরুদ্ধার করে সে জঙ্গীবাজ কম্যুনিস্টদের বিপর্যস্ত করবেই।

যবনিকা কম্পমান

হিমালয় হোটেলে ঢুকেই দমে গেলাম। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে রয়টারের লোকটি ভ্রূ কুঁচকে বললে, "এত দেরিতে? দি স্টোরী ইজ ডেড নাউ। আমরা তো ভাবছি, আজই চলে যাব।"

এমন বেকায়দায় আর পড়িনি। তিব্বতী ঘটনার গরম খবর যোগাড় করতে এসেছি কালিম্পং। কোথায় কালিম্পং আর কোথায় লাসা। প্রায় পাঁচ শ মাইলের ধাক্কা। নাথু গিরিপথের ফাঁকফোঁকর দিয়ে এখানে টুকিটাকি কিছু খবর পাওয়া যায়। কিন্তু রয়টারের সংবাদদাতা ভদ্রলোকটি বলে কি! সব খবর ঠাণ্ডা? তা হলে আমি এসেছি কি করতে? কি খবর পাঠাব তা হলে?

১৯৫৯ সাল একত্রিশে মার্চ কালিম্পঙে পৌঁছেই পড়েছি তোপের মুখে। দেখি, দেশ-বিদেশের বাঘাবাঘা সাংবাদিক ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে দলাই লামার অপেক্ষায়। নাথু-লা গ্যাংটক হয়ে তিনি যদি আসেন, তারই প্রত্যাশায়। এক একজনের দশাসই চেহারা। ইংরেজি বলে গাঁক গাঁক করে। তার আদ্ধেক বুঝি, আদ্ধেক বুঝি না। লোক্যাল ট্রেনের ফিরিওয়ালার মত গলায় কাঁধে হরেক রকম ক্যামেরা ও বাইনাকুলারের মালা। কারও হাতে টেপ-রেকর্ডার। অন্য হাতে ফোলিও ব্যাগের ভিতরে তিব্বতের উপর সরু মোটা একগাদা বই, বিরাট বিরাট ম্যাপ। গট-গট করে এরা টেলিগ্রাফ অফিসে যায়। বই দেখে, ম্যাপ দেখে, লঙ্গিচ্যুড, ল্যাটিচ্যুড মাপে। আর পাতার পর পাতা খট-খট টাইপ করে যায়। কাউণ্টারে প্রেস টেলিগ্রামের স্তূপ গিরি-গোবর্ধনের আকার নেয়।

দলাই লামার দর্শনাভিলাষী সাংবাদিকদের প্রায় সবাই বিদেশী। ডেলী মেল, ডেলী টেলিগ্রাফ, ডেলী মিরর, অবজার্ভার,

নিউ ইয়র্ক টাইমস, রয়টার, লাইফ-টাইম, কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং, এসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস, কেউ বাদ নেই। দেশী কাগজের মধ্যে শুধু দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস আর কলকাতা থেকে প্রেস ট্রাস্ট, ঝানু রিপোর্টারের দল। প্রায় সবারই অস্থায়ী আস্তানা ঐ হিমালয় হোটেল।

তাঁদের মধ্যে আছেন আবার ডেলী মেলের রিপোর্টার-চূড়ামণি জোয়েল বারবার। নিয়াসাল্যাণ্ড থেকে বিমানে সোজা এসেছেন কালিম্পং। এঁদের সকলের মধ্যে বাংলা কাগজের সবেধন নীলমণি আমি। আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। ঘুরতে হবে ভারত-তিব্বত সীমান্ত। পাল্লা দিয়ে পাঠাতে হবে গরম গরম খবর।

আমাকে কালিম্পং আসতেও হয়েছে একেবারে হঠাৎ। তিরিশে মার্চ মাঝরাত্তিরে সহকর্মী শ্রীখগেন দে সরকারের ডাকাডাকি। আধো ঘুমে, আধো জাগরণে দরজা খুলতেই তিনি বললেন,—"এই নাও টাকা, এই নাও কাল বাগডোগরা যাবার প্লেনের টিকিট। সেখান থেকে যাবে কালিম্পং। আচ্ছা চলি, উইশ ইউ বেস্ট অব লাক্।" আমার বাক্যস্ফূর্তির আগেই তিনি বাড়ির দিকে হাওয়া। উত্তেজনায় বাকী রাত আমার ঘুমই হল না। কিন্তু বাড়ির সকলের মুখে আতঙ্কের ছায়া। এই দিনই কাগজে বড় বড় শিরোনামায় বেরিয়েছে শিলচরের কাছে শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ। চব্বিশ জন আরোহীই মারা গিয়েছেন। আজ সকালটাও মেঘলা মেঘলা। 'আচ্ছা প্লেনে না গিয়ে ট্রেনে গেলে হয় না?' বাড়ির লোকদের কি করে বোঝাই, এখন সময়ের দাম কত!

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং। মোটরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। কলকাতার গরম কাটিয়ে পৌঁছলাম ঠাণ্ডার দেশে। রাত্তিরে লেপ-কম্বল না চাপালে হাঁটু-থুতনিতে কত্তাল বাজাতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্তে নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে মহকুমা শহর কালিম্পং। মনেই হয় না, বাংলা দেশের কোন শহর। নেপালী, তিব্বতী, ভুটিয়া লেপচায় ভরা। ব্যবসায়ী সবাই প্রায় অবাঙালী। পথেঘাটে কদাচিৎ বাঙালী চেহারা নজরে পড়ে।

তিব্বতের সাম্প্রতিক বিদ্রোহে এই খুদে শহরের উপর সারা পৃথিবীর নজর পড়েছে। কালিম্পং এখন সংবাদশিকারীর তীর্থস্থান। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্য এই কালিম্পঙের মাধ্যমে। তিব্বতীরা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসে পশম, কম্বল, রঙ-বেরঙের দামী পাথর। ফেরার পথে নিয়ে যায় ছুঁচ থেকে শুরু করে থালাবাসন, জুতোজামা, বনস্পতি, বিস্কুট, সিগারেট সব কিছু। বছরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

তিব্বতে সম্প্রতি অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। চীনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। অশান্ত বাসুকীর ফণা 'পৃথিবীর ছাদে'র উপর গর্জে গর্জে উঠছে। নিষিদ্ধ দেশের এই নয়া-উপাখ্যান ঐ হিমালয়ের মতই রহস্যের আঁধারে ঢাকা। যবনিকার অন্তরাল থেকে অচল হিমাদ্রির দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করে কোন খবর বাইরে যেতে পারে না। অথচ তিব্বতী ঘটনাবলী জানার জন্যে কৌতূহলের সীমা নেই। কালিম্পংই একমাত্র আধুনিক শহর, যেখান থেকে সেই কৌতূহল কিছুটা মেটানো যায়। তাই সংবাদশিকারীদের কালিম্পং ছাড়া 'নান্য পন্থাঃ।' এবং এই কারণেই আমরা সবাই ভিড় জমিয়েছি বিভিন্ন হোটেলে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের অভ্যন্তরে রহস্যময় দেশ তিব্বত। দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক অবস্থানে সে বাইরের পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। ভারত, নেপাল, রুশ, চীন—তার চার সীমান্ত ঘিরে রেখেছে। ছেচল্লিশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই দেশে লোকসংখ্যা পঞ্চাশ

লাখের কাছাকাছি। তার মধ্যে আবার আট দশ লাখ ভিক্ষু থাকেন তিন হাজার মঠে। মঠের মধ্যে প্রধান ড্রেপুং, সেরা ও গন্দন। বড় বড় মঠে দশ বারো হাজার ভিক্ষু থাকেন।

উত্তরে চাং-তাং, অনুর্বর পরিত্যক্ত পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে বড় বড় নদী আর শ্বাপদাকীর্ণ গভীর জঙ্গল। বাকী সব এলাকাই উর্বর, সুফলা। তিব্বতের বুক চিরে গিয়েছে নদী সাংপো। আসামে প্রবেশ করেই সে নাম বদল করেছে। সাংপো হয়েছে ব্রহ্মপুত্র।

একদা তিব্বত ছিল পরাক্রমশালী সামরিক জাতি। মঙ্গোল আর চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে এরা হাত পাকিয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিব্বত অহিংস হল। যুদ্ধাস্ত্র ফেলে দিয়ে শরণ নিল ধর্মের, সঙ্ঘের, বুদ্ধের।

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতের খ্যাতনামা রাজা ছিলেন সং-সেন-গাম্‌পো। তিনি বিয়ে করেন চীন ও নেপালের দুই রাজকন্যাকে। দুজনেই ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের প্রভাবে রাজাও হলেন বৌদ্ধ। চীনা-স্ত্রীর জন্যে তৈরী হল রামশোচে মন্দির এবং নেপালী স্ত্রীর জন্যে তৈরী হল জো-কাং মন্দির। সং-সেন-গাম্‌পোর চেষ্টায় তিব্বত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিল। সৃষ্টি হল লামাবাদ—মহাযানের অন্যতম শাখা।

ভারত থেকে এলেন পদ্মসম্ভব। তন্ত্রে-মন্ত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কাছ থেকে তিব্বত নিল তন্ত্রের দীক্ষা। বাঙালীর ছেলে অতীশ দীপঙ্কর তারও পরে "জ্ঞানের দীপ" জ্বালাতে গেলেন লাসায়।

চীনে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুবলাই খান নিজে বৌদ্ধ হয়ে এক ভিক্ষুকে সর্বপ্রথম বসালেন তিব্বতের রাজার আসনে। নামকরণ হল দলাই লামা। সব দেশ স্বীকার করে নিল দলাই লামার শ্রেষ্ঠত্ব।

তিব্বতের দুই পারে দুই মহান দেশ। ভারত ও চীন। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক বরাবরই মধুর। সংস্কৃতি ও ধর্মীয়

আচারে মনের মিল ভারতের সঙ্গে। জাতি ও সামাজিক আচারে মিল চীনের সঙ্গে। কিন্তু চীনের সঙ্গে তার মনের মিল নেই। প্রাচীন কাল থেকেই তুই দেশ যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সপ্তম শতাব্দীতে চীনারা লাসা দখল করে। কিন্তু ৭৬১ খ্রীঃ তিব্বতীরা চীনাদের হটিয়ে দেয়। এমন কি চীন রাজ্যের কিছুটা দখলও করে বসে।

মাঞ্চুরাজাদের আমলে চীনারা আবার উৎপাত শুরু করে। ১৭২০ খ্রীঃ তিব্বত গেল চীনের দখলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তিব্বত আবার পেল মুক্তি। ১৯১১ সালে সানইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনা বিপ্লবের সময় তিব্বত পূর্ণ স্বাধীন হল। ১৯০৬ সালে চীনা সরকার তিব্বতের উপর বেশী আধিপত্য ফলাতে চাইলে ত্রয়োদশ দলাই লামা পালিয়ে আসেন দার্জিলিং। তারপর স্বাধীনতা লাভের পর ফিরে যান লাসায়।

কম্যুনিস্টরা গদীতে বসার পর ১৯৫০ সালে চীন আবার তিব্বত আক্রমণ করে বসে। পরাক্রমশালী শক্তিমানের হাতে তুর্বল অসহায় তিব্বত আত্মসমর্পণ করে। ভারতের মুখ চেয়ে সে বিফল হয়। ১৯৫১ সালে চীন-তিব্বত চুক্তিতে সে চীনের এক প্রদেশে পরিণত হয়ে পেল শুধু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন; বৈদেশিক সংযোগ ও প্রতিরক্ষার ভার নিল পিকিং। ১৯৫৪ সালে চীন-ভারত পঞ্চশীল চুক্তিতে ভারত স্বীকার করে নিল তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য। তিব্বতীদের অসন্তুষ্টি কিন্তু কমল না।

চীনা-সরকার বরাবরই দলাই লামার পরবর্তী সম্মানিত ব্যক্তি পাঞ্চেন লামাকে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে এসেছে। ১৯২৩ সালে পাঞ্চেন লামা ঝগড়া করে চীন পালান। সেখানেই তিনি মারা যান। ১৯৩৭ সালে চীনারাই আবিষ্কার করে বর্তমান ২১ বৎসর বয়স্ক পাঞ্চেন লামাকে। দলাই লামার দল তাঁকে স্বীকার করে নিল না। দ্বিমতে দেশ দ্বিধাবিভক্ত হল। ঐ বিরোধের সুযোগে চীন তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলালো।

কম্যুনিস্ট চীন তিব্বত দখলের পরই হাত দিল সংস্কারের

কাজে। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ইষ্টমন্ত্র ছড়াতে চাইল মঠে, সংঘায়, সমাজে। মঠকেন্দ্রিক সমাজকে ভেঙেচুরে আনতে চাইল প্রগতি। কিন্তু তিব্বত তার পুরাতন ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে কোন 'ইজমে'র যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে রাজী নয়। সে থাকতে চাইল তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে, তার পুরাতন বিশ্বাস নিয়ে। মুখ্য লামাদের সঙ্গে লাগল বিরোধ। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে ধরা পড়ল কুসংস্কার রূপে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। নীরবে সব সহ্য করেন।

অস্বীকার করে লাভ নেই, ধর্ম-বিশ্বাসের নামে দীর্ঘকাল সেখানে সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কার দানা বেঁধে আছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রধানের দৌরাত্ম্যে সাধারণ লোক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হচ্ছে। তিব্বত সুসভ্যতার আলোক পায়নি। পাওয়ার পথে অনেক বাধা। চীন সেই দুস্তর বাধা অতিক্রমের কাজে হাত দিয়ে মুখোমুখি হল প্রবল সংঘর্ষের।

পূর্বে বিস্তৃত দুর্গম অঞ্চল তখনও চীনের শাসনাধীনে পুরোপুরি আসেনি। সেখানে বাস করে দুর্ধর্ষ খাম্পা উপজাতি। তারা চীনের আধিপত্য কোনদিনই সহজে মেনে নেয়নি। গত পাঁচ ছ বছর থেকেই জানিয়ে আসছে সশস্ত্র প্রতিবাদ। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন। বিক্ষোভ নিল গণ-বিদ্রোহের রূপ। লাসার রাজপথ রক্তাক্ত হল। ব্যাপক সংঘর্ষে ভেঙে পড়ল মঠের চূড়া, মারা গেলেন অসংখ্য তিব্বতী চীনা। দলাই লামা পোতালা প্রাসাদ থেকে পালালেন সদলবলে।

যবনিকার অন্তরাল থেকে গত ১৮ই মার্চ প্রথম পাওয়া গেল ব্যাপক সংঘর্ষের সংবাদ। তারপর এই সংঘর্ষের কথা সরকারীভাবে চীনও স্বীকার করে নিল। কয়েকদিন পরেই লোপ পেল তিব্বতের স্বাধিকার। স্থানীয় সরকার ভেঙে দিয়ে গঠিত হল ষোল জন সদস্যের প্রস্তুতি কমিটি। পাঞ্চেন লামার উপর পড়ল নেতৃত্বের

ভার। তাঁর সদর দপ্তর শিগাৎসে থেকে তিনি রওনা হলেন রাজধানী লাসার দিকে।

এদিকে পলাতক দলাই লামাকে নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। চীনা সরকার বলল বিদ্রোহীরা তাঁকে নিয়ে পালিয়েছে। অনেকে চীনা বক্তব্যে বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বললেন, দলাই লামা স্বেচ্ছায় লাসা ত্যাগ করেছেন। চীনা কর্তৃত্ব কোনদিনই তাঁর পছন্দ হয়নি।

দিন যায়। বিশ্বের সংবাদপত্রে তিব্বত ছাড়া কোন খবর নেই। তিব্বত আর দলাই লামা।

ইতিমধ্যে চীনারা ভারতীয় শহর কালিম্পং-এর নামে আনলে অভিযোগ। বললে,. কালিম্পং তিব্বতী বিদ্রোহ পরিচালনার অন্যতম ঘাঁটি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু সে অভিযোগ অস্বীকার করলেন। ভারতীয় লোকসভায় এ নিয়ে হৈ চৈ।

সারা দেশ জুড়ে এক প্রশ্ন, দলাই লামা কি ভারতে আসবেন? ভারত কি চীনের মৈত্রীর জন্যে বিপদাপন্ন প্রতিবেশী তিব্বতের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখাবে না? একমাত্র কম্যুনিস্ট দল ছাড়া ভারতের সবাই দলাই লামার ভারত আগমনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।

এমন মাহেন্দ্রক্ষণে আমি এসে পৌঁছলাম কালিম্পঙে। এসে দেখি অতি উৎসাহী ঐ সকল বিদেশী সাংবাদিকের 'হিমালয়ী অতিরঞ্জনে' আসল সত্য চাপা পড়ে গেছে। চীনকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে এবং কেউ কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে 'কল্পনায় অবগাহি' নিজের খুশিমত খবর পাঠিয়ে চলেছেন। কালিম্পং পরিণত হয়েছে উড়ো খবরের এক আড্ডায়।

তবে চীনা সরকারের কালিম্পঙের মুখে কালি ঢালার কোন কারণ নেই। এখান থেকে উস্কানি বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামিয়েছে, নয়াচীনের এ অভিযোগ মিথ্যা। ব্যবসায়িক যোগা-যোগের কারণে এখানে দু চারটে টুকিটাকি খবর আসে। তাই

সাংবাদিকরা এসেছেন। তাছাড়া পাঁচ ছ হাজার তিব্বতী বাসিন্দা এখানে আছেন বহু বছর ধরে। এঁদের কেউ কেউ তিব্বতে চীনের আধিপত্যে সন্তুষ্ট নন ঠিকই, কিন্তু বিদ্রোহে এঁদের যোগাযোগ থাকার কোন প্রমাণ নেই। শুধু বলা যায়, তিব্বতের ক্ষতি ও দলাই লামার বিপদাশঙ্কায় এঁরা উদ্বিগ্ন! এই উদ্বেগ ভারতবাসীর আরও অনেকের মনে আছে।

ঘুরে বেড়ালাম কালিম্পঙের চারদিক। গেলাম আশেপাশে কয়েকটি জায়গায়। নানাসূত্রে কিছু সংবাদও সংগ্রহ করলাম। কিন্তু কোনটাই পাকা খবর বলে মনে হল না। মুশকিলে পড়লাম। কি খবর পাঠাই।

শেষমেষ দুয়ে আর দুয়ে চার অঙ্ক মেলাতে বসলাম। খবর বেরিয়েছে, দলাই লামা আসছিলেন গিয়াংশে ফাঁড়ি ইয়াতুং হয়ে গ্যাংটকের দিকে। ঐ পথে সদাজাগ্রত চীনা প্রহরীর শ্যেন দৃষ্টি এড়ানো তাঁর সম্ভব হয় নি। তাই এখন তাঁর যাত্রা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। খাম্পা অধ্যুষিত দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়ে। ঐ দিকে তিনি কোথায় যেতে পারেন? হয় ব্রহ্মদেশ, নয় ভূটান বা আসাম। ব্রহ্মদেশে পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে বাকী থাকে ভূটান বা আসাম। আন্দাজ করা যায়, তিনি ঐ পথেই পাড়ি দিচ্ছেন। আর আসামে পা দিলে তিনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন ভারত সরকারের কাছে। আমার প্রথম খবর গেল, দলাই লামা সম্ভবত আসামের পথে পাড়ি দিয়েছেন। পরদিন, অর্থাৎ ২রা এপ্রিল আনন্দবাজারে ফলাও করে বেরোল সেই সংবাদ। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন কাগজে বেরোল না।

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বেরিয়ে কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিংয়ের মিঃ বোনারের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে হিন্দুস্থান টাইমসের শ্রীনিবাসন ও প্রেস ট্রাস্টের মাধব ভট্টাচার্য। বোনারের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয়

ছিল। রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন ব্ল্যাস্ট ফার্নেসের চুল্লী জ্বালাতে যান, তখন তাঁর সাথে আলাপ হয়।

"হ্যাল্লো চৌধুরী, তুমি এখানে ?"

"তুমি যে কারণে এসেছ, সেই কারণেই।"

"কিন্তু খবর যে সব ঠাণ্ডা।"

"দেখা যাক্, ঠাণ্ডাঘর থেকে তাজা খবর বের করা যায় কি না।"

আমি এগোলাম গ্যাংটক যাবার গাড়ি ঠিক করতে। কালিম্পং থেকে গ্যাংটক প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

জীপে চড়ে গ্যাংটক যাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। সর্পিল রাস্তার দুধারে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই।

এধারে ওধারে হাতির পায়ের মিছিলের মত অতিকায় শাল গাছের সারি। নাম-না-জানা ফুল আর গাছপালার অজস্র সম্ভার। চুলের কাঁটাকে হার-মানানো পিচঢালা সরু রাস্তার বাঁক চড়াই বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে। রাস্তার পাশে যাত্রা-সঙ্গিনী রঙ্গিনী তিস্তা। হিমালয়ের গিরিশ্রেণী ভেদ করে চুলের সিঁথির মত খলখল ছুটে চলেছে উৎরাইয়ের দিকে। পাথরের নুড়ির গায়ে আছাড় খেয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। দূরে তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেত-মুকুট। সাদা মেঘ পাহাড়ের গায়ে লুকোচুরি খেলে, বাঁকের পর বাঁক পেরোয়। আর জীপ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। আরও সামনে। বুঝিবা ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াকে হাতের মুঠোয় ধরতে চায়।

মাঝরাস্তায় রংপো। ভারত-সিকিমের সীমানা। ভারতীয় নাগরিকের কোন পারমিটের প্রয়োজন হয় না। পুলিসের খাতায় শুধু নাম-সই করে ঢুকলাম সিকিম রাজ্যের সীমানায়। মাইল পঁচিশ পরেই পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল গ্যাংটক—পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাজধানী।

ছবির মত সুন্দর শহর। কারুকার্যে মোড়া বাড়িঘর। হাসপাতাল, ইস্কুল, থানা, সেক্রেটারিয়েটের নির্মাণ-কলা ও অঙ্গ-সজ্জায় সুরুচির ছাপ। উঁচু-নীচু পাহাড়ের গায়ে ফাঁক ফাঁক বাড়ি। একমাত্র জনবহুল জায়গা গ্যাংটক বাজার। মনোহারী জিনিসের সারি সারি দোকান। ছু-তিনটে হোটেল।

বাজারের উপর তিব্বতীয় ব্যবসায়ীদের আড্ডা। মালবাহী খচ্চরের আনাগোনা। এখান থেকে এরা সওদা করে রওনা হয় ইয়াতুংয়ের দিকে। গত কয়েক দিন ব্যবসা ছিল বন্ধ। সবে আবার শুরু হয়েছে। তাই গ্যাংটক বাজারে বেশ তৎপরতা।

আমি উঠলাম ডেন-জং হোটেলে। সেখানেই উঠেছিলেন পাংদা শাং। ভারতে তিব্বতের প্রথম উদ্বাস্তু।

পাংদা শাং ১৯৪৫ সালে ছিলেন কালিম্পঙে চীনা বাণিজ্য প্রতিনিধি। তারপর চলে যান লাসায়। বড় কাজ নিয়ে। তাঁকে বলা হয় 'তিব্বতের বিড়লা।' অগাধ ধনী। প্রথম তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট চীনের আস্থাভাজন। তারপর নাকি মত পালটে যায়। লাসায় গোলমালের সময় তিনি গিয়েছিলেন উত্তর সিকিমের কাছাকাছি সাকেৎ। এক জমির গোলমালের বিরোধ মেটাতে। সেখান থেকে লাচেন, ডিকশু হয়ে এসেছেন গ্যাংটক। সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী ও ত্রিশ-চল্লিশটা খচ্চরের পিঠে মূল্যবান জিনিসপত্র।

পাংদা শাংয়ের সঙ্গে দেখা হল হোটেলে। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সহজে মুখ খুলতে চান না। তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ উদ্ধার করা অসম্ভব মনে হল।

পাংদা শাংয়ের তরুণী কন্যা থাকে কালিম্পঙে। মিশনারী ইস্কুলে পড়াশোনা করেছে। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। সে হোটেলে এসে বাবাকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর সবাই মিলে গেলেন কালিম্পং। সেখানে তাঁদের বাড়ি আছে। হয়তো

স্থায়ী ভাবেই তিনি বাস করবেন কালিম্পঙে। তিব্বতের দিকে আর পাড়ি দেবেন না।

ওই হোটেলেই উঠেছেন আমাদের বন্ধু শ্রীঅজিত দাশ। আমেরিকার টেলিভিশনের জন্যে ছবি পাঠান, ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকায় খবর পাঠান এবং কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্মব্যস্ত লোক। নানা কাজে তিনি আগে গ্যাংটক এসেছেন বহুবার।

দাশ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হলেন, আমিও। সঙ্গী পেলে কে না খুশী হয়। আমি বসে বসে নূতন খবরের মক্স করি, আর তিনি পাতার পর পাতা টাইপ করেন। সন্ধ্যের দিকে দুজনেই ছুটি টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

পরদিন রওনা হলাম নাথু-লার দিকে। নাথু-লার চৌদ্দ মাইল দূরে ইয়াতুং থেকে নূতন রাস্তা খোলা হয়েছে। এদিকে নাথু-লার চৌদ্দ মাইল দূর ইয়াতুং থেকে লাসা পর্যন্ত নূতন রাস্তা বানিয়েছে নয়াচীন। জীপ গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। তবু আদি-অকৃত্রিম পদযুগল এবং খচ্চরের পিঠ এখনও প্রধান বাহন।

নাথু-লার পথে না এলে কোনদিন বুঝতে পারতাম না, 'সাংঘাতিক সুন্দর' রাস্তা কাকে বলে। এমন রাস্তায় আত্মহত্যা করেও বুঝি আরাম আছে। কালিম্পং-গ্যাংটকের রাস্তা তো এর কাছে শিশু। সরু রাস্তার একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্য পাশে হাজার হাজার ফুট খাদ। মরণ-বাঁকের ফাঁকে একবার চাকা ফসকালেই দফা গয়া।

এমন সুন্দর জায়গাও বোধ করি আর নেই। লোক নেই, জন নেই, শুধু নয়নাভিরাম পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের নীলে আর আকাশের নীলে মাখামাখি। তারই বুকের ভিতর দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা।

প্রায় আট-দশ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। খানিক দূর গিয়ে দেখি লাসার পথে রওনা হয়েছে

খচ্চরের মিছিল। সঙ্গে পদযাত্রী তিব্বতী ব্যবসাদারের দল। নিস্তরঙ্গ হিমালয়ের বুক চিরে শোনা যায়, খচ্চরের গলায় ঝুলানো বড় পেঁপের আকারের মত বড় বড় ঘণ্টায় বেজে চলেছে গং—গং—গং। একটানা একঘেয়ে। ধীরে ধীরে সে শব্দও দূরে সরে যায়। 'গঅং—গঅং—গঅং'—অনেকক্ষণ কানের কাছে তবু মন্ত্রের মত বাজতে থাকে।

মাইল দশেক পরে এলাম কার্পোরাং। একটু পরেই পনর মাইল, শেরাথাং ছঙ্গু হ্রদ। এখানে আছে ভারত সরকারের চারটি চেকপোস্ট। খবর নিয়ে জানলাম, চেকপোস্টগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিব্বতী উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে। ঔষধপত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

বেশীদূর এগোনো সম্ভব হল না। সামনে বরফ। গাড়ি বেশীদূর যেতে পারবে না। তার উপর ঐ খিল-ধরানো, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডাকে শায়েস্তা করানোর মত গরম জামা-কাপড় নিয়ে আসিনি। সুপটু জীপ-চালকের হাতে আবার জীবন সঁপে দিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এলাম গ্যাংটকে।

ভর এপ্রিল মাসেও কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার চড়চাপড়। এক পায়ে দাঁড়ানো ঐ গাছের পাতায় চোলাই করা হাড়-কাঁপানো হাওয়া ঠকাস্ ঠকাস্ ধাক্কা মারছে হোটেলের জানালায়। একে ঠাণ্ডা, তার উপর পথশ্রমের ক্লান্তি। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। হোটেলের ঘরে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ে দাশের সঙ্গেই গল্প জুড়ে দিলাম। দাশ টাইপ করার ফাঁকে ফাঁকে হুঁ-হাঁ করছিলেন।

"বুঝলেন, আপনারা তো রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বলেই জানেন, কিন্তু তিনি যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে কত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন তা তো জানেন না।"

"কি রকম?"—দাশের সকৌতুক জিজ্ঞাসা।

"চীন যে তিব্বত দখল করবে, তা তিনি অনেক আগেই বলেছিলেন।"

"কোথায়? কোন বইয়ে? তাহলে আমার এই রিপোর্টটায় লাগিয়ে দিই।"

"বইয়ে টইয়ে নয়, গানের মধ্যে।"

"যাঃ।"

"যাঃ বললেই হল? খুলুন 'গীতবিতান', বের করুন তিন শ' চব্বিশ পৃষ্ঠা; দেখবেন, একটি গানের পয়লা পঙ্‌ক্তি হচ্ছে— "একদিন চীনে (চিনে) নেবে তারে, তারে চীনে নেবে—"

চীন যে তিব্বতকে নেবে, একথা কি সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন দেখুন তো।"

দাশ টাইপরাইটারে চটুল করাঙ্গুলির বিশ্রাম দিয়ে হো-হো হেসে ওঠেন।

"দাঁড়ান, আরও বাকী আছে। তিব্বত যে 'অনাদরে কুণ্ঠিতা' রয়েছে, তাও উল্লেখ করেছেন। এবং বলছেন, 'সরে যাবে নবারুণ আলোকে, এই কালো অবগুণ্ঠন'—নয়াগণতন্ত্রের নবারুণ আলোকে অবগুণ্ঠনবতী তিব্বতের লজ্জা যে ঘুচে যাবে, তাও পরিষ্কার বর্ণনা করে গেছেন। তারপরেও রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যদ্বক্তা বলবেন না?"

দাশের আর এক দফা হাসির পালা। কিন্তু হাসির দমক মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘরের দরজায় টোকা। ঠক্ ঠক্ ঠক্। দাশের টেলিগ্রাম নিয়ে পিয়ন এসেছে। জরুরী টেলিগ্রাম। লণ্ডন থেকে ইউনাইটেড প্রেসের অফিস লিখছে, দলাই লামা নাকি তোয়াং হয়ে আসামের দিকে আসছেন এবং ভারতীয় পুলিস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছে।

টেলিগ্রাম বলে কি? তাহলে, তাহলে 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু খবরটা সত্যি তো? দাশ ও আমি দুজনেই উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকি।

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে দলাই লামার ঠিকানা তাহলে পাওয়া যাচ্ছে।

এমন সময় কালিম্পং থেকে টেলিফোন এসে হাজির। প্যাট কিলেন নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক জানাচ্ছে, পিকিং রেডিও ঘোষণা করেছে, দলাই লামা নাকি তোয়াং অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তোয়াং? কোথায় সেই তোয়াং? দুজনেই ভাবছি এখ্‌খুনি ছুটে যাই তোয়াং।

পরদিন সকালে আপাতত দুজনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটি পলিটিক্যাল অফিসার আপ্পাসাহেব পন্থের বাড়িতে। গিয়ে দেখি, বিদেশী কাগজের আরও কয়েকজন ইতিমধ্যে হাজির হয়েছেন। আমাদের সকলেরই "আঁখি রইল 'পন্থ-পানে' চাইয়া।"

খানিক পর পন্থসাহেবের অফিসঘরে ঢুকলাম। দীর্ঘদেহ সুপুরুষ আপ্পাসাহেব পন্থ। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদমর্যাদায় প্রচুর সুনাম কিনেছেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ও আয়তনেত্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন।

আমাদের সকলেরই এক প্রশ্ন,—দলাই লামা আসামের দিকে আসছেন, পন্থসাহেব একথা জানেন কিনা। পন্থসাহেব নেতিবাচক উত্তরে দিলেন। বললেন, "দেখুন, আমার পক্ষে বলা মুশকিল। ইয়াংতুংয়ের দিকে এলে বলতে পারতুম। আসামের কথা, শিলং বা দিল্লীই ভাল বলতে পারে।"

"কিন্তু কোথায় সেই তোয়াং?"

"দাঁড়ান দেখাচ্ছি।"

পন্থসাহেব আসাম-তিব্বত সীমান্তের এক অতিকায় মানচিত্র বের করলেন। দেখালেন তোয়াঙের অবস্থান। আসামের উত্তর সীমান্ত নে-ফার কামেং ডিভিশিন, ভূটানের পূর্ব সীমান্ত ও তিব্বতের উত্তর সীমান্তে ছোট্ট এক বিন্দু ঐ তোয়াং—সারা পৃথিবী যার দিকে চেয়ে আছে।

তারপরের খবর সংক্ষিপ্ত। পরদিন অর্থাৎ তেসরা এপ্রিল

প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় সদস্যবর্গের (কম্যুনিস্ট বাদে) বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন, পূজ্যপাদ দলাই লামা গত ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় সদলবলে ভারত সীমান্তে পা দিয়েছেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কামেং ডিভিশনের তোয়াং এসে পৌঁছবেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর কামেং ডিভিশনের সদর দপ্তর বমডি-লা আসবেন। সরকারী লোকেরা তোয়াং যাচ্ছেন দলাই লামাকে স্বাগত জানাতে। কারণ, ভারত সরকার দলাই লামাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সংকল্প করেছেন।

সারা ভারত জুড়ে হৈ-চৈ। সকলের মুখে দলাই লামা ছাড়া কোন কথা নেই। কালিম্পং, গ্যাংটকে তো মহোৎসবই শুরু হয়ে গেল। তাঁদের 'কল্যাণ প্রার্থনা' এতদিনে সার্থক হয়েছে। দলাই লামা নিরাপদে আছেন। এখানকার বৌদ্ধজগতে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি থাকতে পারে।

কল্পনা করতে পারি, কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে চব্বিশ বছর বয়সের এই তরুণ-ভগবান স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পথ বেছে নিয়েছেন। শুধু দুর্গম নয়, অনিশ্চিত সেই পথ। এক অস্বস্তিকর বিভীষিকার করালগ্রাস থেকে মুক্তি কামনায় চিরকুমার ব্রহ্মচারী বাসভূমি পরিত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছেন ভারতের পথে —ভগবান তথাগতের দেশের পথে। বৃদ্ধা মাতা, তরুণী ভগিনী, কিশোর ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে তিনি ফেলে এসেছেন লাসার আধ্যাত্মিক বৈভব, সর্বজনের শ্রদ্ধাসম্মান। ভারতের মাটি তাঁকে ডাক দিয়েছে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

দুর্গম হিমালয়ের উপত্যকায় খাম প্রদেশের দুর্ভেদ্য অরণ্যের বুকে আত্মগোপন করে আকাশচুম্বী চড়াই ডিঙোবার সময় কিংবা মুখর তরঙ্গিণী সাংপো নদীর উপলউচ্ছল স্রোতোধারা অতিক্রমের সময় হয়তো তাঁর মনে পড়েছে মাত্র কিছুদিন আগেই নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব ও হিংসায় উন্মত্ত লাসার কথা। বিদ্রোহী তিব্বতী ও চীনা মুক্তিফৌজের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে। তাঁরই

গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নরবুলিংকার চূড়ো গুলীর আঘাতে ধুলোয় গড়িয়েছে। নিরস্ত্র বৌদ্ধভিক্ষুর পীত উত্তরীয় বুলেট-বিদ্ধ বুকের তাজা রক্তে রঙ-বদল করেছে। মঠে, সন্ধ্যায় 'ওম মণিপদ্মে হুম' মন্ত্র অর্ধোচ্চারিত থেকে গেছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার, আর্তনাদ। করুণাঘনের চিরমধুনিষ্যন্দী বাণী কারও কানে গিয়ে পৌঁছয়নি।

তাই তিনি বুঝিবা ভেবেছেন, লোভ-জটিল, ঘোর-কুটিল সেই পথের চেয়ে শান্তির পথ, ভারতের পথ ঢের ঢের ভাল। গোপনে, অতি গোপনে হিংসোন্মত্তদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বুদ্ধগত-প্রাণ দলাই লামা নিজেকে সঁপে দিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে—ঠিক নয় বছর আগে তিব্বতের মাটিতে চীনের আকস্মিক আক্রমণের সময় যেমনি দিতে চেয়েছিলেন। তখন কেউই বোধ হয় জানত না, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শীঘ্রই ঘটছে।

এই চতুর্দশ দলাই লামা নিয়ে আজ সারা পৃথিবী তোলপাড়। তিনি তিব্বতের শুধু রাজা নন, রাজার রাজা—স্বয়ং ভগবান।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে চীনা প্রদেশ চিংঘাইয়ের আমদো গ্রামে কুকুনর হ্রদের কোল-ঘেঁষা এক দরিদ্র চাষী পরিবারে যে শিশুটি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিল, সেই শিশুই একদিন পৃথিবীর বুকে আলোড়ন আনবে একথা কে জানত। দলাই লামা নিজেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন সেই অতীত ইতিহাসের কথা।

ত্রয়োদশ দলাই লামা মারা গেলেন ১৯৩৩ সালে। নূতন দলাই লামার আসনে কে বসবেন? এ তো বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়, বুদ্ধের অবতারের মহামান্য আসনে বসতে হলে বহু লক্ষণ মেলা চাই। সেই লক্ষণ যে মানবশিশুর দেহে আচরণে প্রকাশ পাবে, তিনিই হবেন ভবিষ্যতের পরমপূজ্য মহামান্য দলাই লামা।

ত্রয়োদশ দলাই লামা, যিনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীনা আধিপত্যে উত্ত্যক্ত হয়ে দার্জিলিং পালিয়ে এসেছিলেন, মৃত্যুর সময় পুবে হেলেছিলেন। মুখ্য লামারা ভাবলেন, তাহলে হয়তো নির্দেশ,

পুবে যাও, সেখানে মিলবে নূতনের সন্ধান। রাজপ্রতিনিধিও আভাস পেলেন কিছু কিছু। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সোনার ছাদে মোড়া একটি তেতলা মঠ, সেখানে একটি শিশু।

১৯৩৭ সালে এক অনুসন্ধানী ভিক্ষুদল বেরিয়ে পড়ল নূতন দেবতার সন্ধানে। পুবের দিকে। সঙ্গে নিল ত্রয়োদশ দলাই লামার ব্যবহৃত নানা জিনিস। রাজপ্রতিনিধির সেই স্বপ্নের অনুরূপ চিংঘাই প্রদেশের আমদো গ্রামে দেখা গেল সোনার ছাদে মোড়া তেতলা মঠ। ভিক্ষুদল ভৃত্যের ছদ্মবেশে মঠে প্রবেশ করলেন। সেখানে থাকে এক চাষী পরিবার।

প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আড়াই বছরের এক ক্ষুদ্রশিশু পরম উৎসাহে কেড়ে নিল ত্রয়োদশ লামার উত্তরীয়। এবং শিশুকণ্ঠের কলকাকলিতে, কি আশ্চর্য, চীৎকার শোনা গেল—'সেরা লামা, সেরা লামা।'

ভিক্ষুদলের মনে আনন্দ ধরে না। এ ওর মুখের দিকে তাকান। সব লক্ষণই মিলে যাচ্ছে। ভৃত্যের ছদ্মবেশ, অথচ তাঁরা যে 'সেরা' মঠের লামা এই অবোধ শিশু জানতে পেরেছে, ত্রয়োদশ দলাই লামার পরিচ্ছদ চিনে নিতেও ভুল করে নি। এই তো পাওয়া গেছে তাঁদের বহু সাধনার ধন—ঈপ্সিতের সন্ধান। এইতো ভবিষ্যৎ দলাই লামা—রাষ্ট্রগুরু, ধর্মগুরু ও ভগবান। আনন্দ সংবাদ দিতে তাঁরা ছুটে এলেন লাসায়।

১৯৩৯ সালে এলেন চারজন লামা। স্থানীয় চীনা শাসককে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে সপরিবার পয়োমন্ত শিশুকে গোপনে নিয়ে এলেন লাসায়। রাজকর্মচারী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল অজ্ঞাত পল্লীর এক অখ্যাত শিশুকে দিলেন চতুর্দশ দলাই লামার রাজকীয় সম্মান। ১৯৪০ সালে অভিষেকও সম্পন্ন হয়ে গেল।

তারপর শুরু হল সাধনা—দীর্ঘ কঠিন সাধনা। রাজপ্রতিনিধি রাজ্য চালান। আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও তত্ত্ব বিচারে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। পোতালা প্রাসাদের নিভৃত

কক্ষে একাকীত্বের দিন কাটে। ধীরে ধীরে দলাই লামা সাবালক হলেন। নিজ হাতে নিলেন শাসন পরিচালনার ভার।

দলাই লামা ১৯৫৬ সালে পাঞ্চেন লামাকে নিয়ে এসেছিলেন ভারত দর্শনে। তিনি আবার এসেছেন ভারতের মাটিতে। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে।

কালিম্পং এসে দেখি, বিদেশী সাংবাদিকের দল তল্পিতল্পা গোটাচ্ছেন। দলাই লামার পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। এখন তাঁদের লক্ষ্যস্থল তোয়াং। কিন্তু সেখানে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। জঙ্গলের ভিতর শুধু পায়ে-হাঁটা পথ। আর আছে দুর্দান্ত দাফলা উপজাতির দৌরাত্ম্য। তাছাড়া সেখানে যেতে হলে ভারত সরকারের অনুমতিও দরকার। তাঁরা ঠিক করলেন, নে-ফার সদর দপ্তর শিলং কিংবা নিকটবর্তী সহর তেজপুর পাড়ি দেবেন।

এক মুহূর্ত দেরি করার সময় নেই। ট্রেনে যেতে প্রায় দু দিনের ধাক্কা। তাঁরা ছুটলেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এজেন্টের কাছে। 'হেলিকপ্টার পাওয়া যাবে? কিংবা চার্টার করার বিমান?' এক্ষুনি দরকার।

এজেন্ট সকৌতুকে হাসেন। বলে কি এঁরা? এখন কোথায় মিলবে হেলিকপটার আর চার্টার করার বিমান? তার চেয়ে বরং চলে যান কলকাতা, সেখানে চেষ্টা করে দেখুন। কালিম্পং থেকে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাই সই। হিমালয় হোটেল খালি করে প্রায় দু ডজন সাংবাদিক এলেন কলকাতা। সেখান থেকে কেউ শিলং কেউবা তেজপুর! কালিম্পং গ্যাংটকের টেলিগ্রাফ অফিসের বাবুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, হংকং, টোকিও থেকে অজস্র সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান এসে ভিড় জমালেন তেজপুরে। আসামের এই অখ্যাত সহর সদাব্যস্ত সংবাদ-শিকারীর চঞ্চলতায় মুখর হয়ে উঠল। পৃথিবীর সংবাদপত্রে তেজপুর শিরোনামায়

বেরোতে লাগল দলাই লামার বহু খবর। দলাই লামা আর দলাই লামা। দলাই লামা ছাড়া দেশবিদেশের কাগজে আর কোন খবর নেই।

সহরে নেমেই এঁরা সাড়া জাগিয়েছেন। বিপুল অর্থের বিনিময়ে যাবতীয় ট্যাক্সি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া করেছেন, দু আনার চা খেয়ে একশ টাকার নোট দোকানীর হাতে তুলে দিয়েছেন এবং টেলিগ্রাফ অফিসের কাউণ্টারে কাউণ্টারে শতসহস্র শব্দে ভরা গরম গরম খবরের তুফান ছুটিয়েছেন।

এঁরা বমডি-লা যাবার তাক কষেন। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অগত্যা প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবে আড্ডা জমান আর নূতন কিছু পাঠাবার প্ল্যান মক্স করেন। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই আছে ভেরউইর এলুইনের নে-ফা সংক্রান্ত একখানা প্রামাণ্য বই। তার থেকেই মালমশলা নিয়ে তোয়াং বমডি-লা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠান।

অনেকে আবার ছোট ছোট বিমান চার্টার করে প্রায় প্রতিদিনই দিল্লী-কলকাতা-শিলং-তেজপুরে মাকু মারছেন। ঐরকম একটা বিমানের মধ্যেই একজন আবার ফটো ডেভেলাপ ও প্রিণ্টের জন্যে ডার্করুম খুলে দিয়েছেন। কেউ-কেউ নে-ফার নিষিদ্ধ অঞ্চলের উপর দিয়ে বিমান চালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। ডেলি মেলের নোয়েল বারবার তেজপুরে টেলিফোন করার অসুবিধে দেখা দেওয়ায় প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ করে বিমানে জলপাইগুড়ি এসেছেন। লণ্ডনে ট্রাঙ্ক কল বুক করেছেন। কাজ সেরে তেজপুরে ফিরে গিয়েছেন।

কিছুদিন পরই অস্ট্রিয়া থেকে হাজির হলেন এসে হাইনরিখ হারের। 'তিব্বতে সাত বছর' বইয়ের লেখক, দলাই লামার বিশেষ বন্ধু। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী যুদ্ধের সময় দেরাদুনের জেল থেকে পালিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে লাসা যান। ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণের সময় আবার লাসা থেকে পালান।

হারেরকে বহু টাকা দিয়ে ডেলি মেল নিয়োগ করেছে। তার সঙ্গে এসেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিকা ডোনা চার্চিল। হারের তথ্যাদি সরবরাহ করেন আর চার্চিল 'জ্বালাময়ী ভাষায়' পাতার পর পাতা টাইপ করে যান।

সমতল ভূমিতে দলাই লামা কবে নামছেন, তারই প্রতীক্ষায় সারা তেজপুর উদগ্রীব হয়ে আছে। তিনি এখনও আছেন তোয়াংয়ে, দীর্ঘ পদযাত্রার ক্লান্তির অবসানে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের পুরনো তোয়াংয়ের এই বৌদ্ধমঠ। পাহাড়ের চূড়ায় বহু বৌদ্ধভিক্ষুর উপনিবেশ। প্রায় হাজার ত্রিশেক লোক থাকে তোয়াংয়ে। তার মধ্যে মোনপাজ উপজাতিরাই প্রধান।

তোয়াং থেকে বমডি-লা প্রায় ৭০ মাইল। পায়ে হেঁটে আসা ছাড়া কোন উপায় নেই। কামেং ডিভিশনের পলিটিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন হরমান্দার সিং তোয়াং গেলেন দলাই লামাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।

দলাই লামা তোয়াংয়ে তিন দিন বিশ্রামের পর ৮ই এপ্রিল বমডি-লা রওনা হলেন। তোয়াং গুম্ফায় প্রার্থনা সেরে ছু দলে ভাগ হয়ে ঘোড়ার পিঠে ভারতের পথে অগ্রসর হলেন দলাই লামা।

দুর্গম গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন হাঁটতে হাঁটতে ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় পেঁাছলেন বমডি-লা। পথে ডিরাং জং সানজং যুকমাডং রাহুংয়ে নিয়েছেন বিশ্রাম। বমডি-লা থেকে খেলাং হয়ে ৬০ মাইল দূরে ফুটহিলস। ১৮ই এপ্রিল দলাই লামার দল এসে পেঁাছল তেজপুর।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পি. এন. মেনন এসেছেন বমডি-লা। জয়েন্ট সেক্রেটারি সমর সেনও এলেন তেজপুরে। দলাই লামা ট্রেনে ২১শে এপ্রিল পেঁাছবেন মুসৌরী। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ২৮শে এপ্রিল তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

স্টেনগানসহ আসাম রাইফেলের এক বাহিনীর আড়ালে দলাই

লামার জীপ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছল ফুটহিলস। পিছনে বিরাট কনভয়।

বিধিনিষেধের সমস্ত আইনকানুন উপেক্ষা করে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ক্যামেরাম্যানের দল প্রায় লাফিয়ে পড়লেন জীপের ওপর। সমতল ভূমিতে নামার পর দলাই লামার প্রথম চিত্র সকলেরই চাই। দলাই লামা স্মিতহাস্যে কাউকে নিরাশ করলেন না।

তেজপুরে সম্বর্ধনা সভায় দলাই লামার বহু প্রত্যাশিত বিবৃতি পাঠ করা হল। সাংবাদিকদের সাইক্লোস্টাইল করা ইংরেজী কপি দেওয়া হল। সকলে বিদ্যুৎগতিতে ছুটলেন টেলিগ্রাফ অফিসে।

দলাই লামার এই বিবৃতি চমকপ্রদ। তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন, বিপ্লবীদের জবরদস্তিতে নয়, স্বেচ্ছায় তিব্বত ছেড়ে ভারতে এসেছেন। দলাই লামা আরও বললেন, চীনা কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালের চুক্তি উপেক্ষা করে ক্রমান্বয়ে তিব্বতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন এবং তার ফলেই চীন-তিব্বত ১৭ দফা চুক্তি ব্যাহত হয়। ওই চুক্তিতে তিব্বত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করবে বলে ঠিক হয়েছিল। চীন সরকারের চাপে পড়ে তিব্বত ওই চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

দলাই লামা বললেন, ১৭ই মার্চ, নরবুলিংগা প্রাসাদের উপর চীনারা মর্টার দিয়ে গুলীবর্ষণ করে। ওই সংকটজনক অবস্থাতেই তিনি সপরিবারে লাসা ত্যাগে বাধ্য হন। উন্মুক্ত উদারতায় প্রসন্ন বাহু প্রসারিত করে ভারতবর্ষ তাঁকে আশ্রয় দেওয়ায় দলাই লামা ভারতবাসীকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দলাই লামার সঙ্গে প্রায় ৯০ জন লোক আছেন। সঙ্গে এসেছেন মা, এক বোন, এক ভাই ও অন্যান্য পরিজন। দুজন গৃহ-শিক্ষক, ভূতপূর্ব মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য, একজন প্রধান গৃহাধ্যক্ষ, তিনজন প্রধান পরিচালক, একজন গৃহাধ্যক্ষ, গন্দন, সেরা ও দ্রেপুং মঠের একজন করে প্রতিনিধি, অন্যান্য অফিসার ও

ভৃত্যবর্গ। দলাই লামার বড় ভাই থনডুপ ছিলেন দার্জিলিংয়ে। তিনি ছুটে আসেন তেজপুর। আত্মীয়স্বজনের ভিতর দলাই লামাকে বেশ হাসিখুশীই দেখায়।

বেলা দেড়টায় তেজপুর থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়ে। আসাম, বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের জনপদ অতিক্রম করে গাড়ি পেঁাছবে দেরাদুন। সেখান থেকে মোটরে মুসৌরী—দলাই লামার সাময়িক আবাসস্থল। তেরখানি কোচ। তার মধ্যে কয়েকখানি এয়ার-কণ্ডিশন করা। দলাই লামার জন্যে আলাদা কামরা। তিব্বতী, ভারতীয়, ইউরোপীয় তিন রকমের খাবার রাখা হল ট্রেনে। যা চাইবে, তাই পাবে দলের লোক। রঙ্গিয়া আলিপুরদুয়ার হয়ে উনিশে এপ্রিল সকাল সাড়ে নটায় দলাই লামার ট্রেন পেঁাছবে শিলিগুড়ি। সেখানে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রায় দশ হাজার লোক এসে জড় হল শিলিগুড়ি স্টেশনে। তার আদ্ধেকই প্রায় তিব্বতী, ভূটিয়া, লেপচা, নেপালী। কালিম্পং, দার্জিলিং, গ্যাংটক থেকে গাড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে তারা এসেছে। অনেকে এসেছে পায়ে হেঁটে। নর্থ স্টেশন প্ল্যাটফর্মের পিছনে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু এক মঞ্চ বানানো হয়েছে। দলাই লামা সেখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের দর্শন দেবেন, আশীর্বাদ করবেন।

রঙবেরঙের পোশাক, ধূপের গন্ধ, প্রার্থনা-পতাকার পতপত শব্দ, 'ওম মনি পদ্মে হুম' মন্ত্রোচ্চারণ ও তিব্বতী অর্কেস্ট্রার শব্দে গোটা স্টেশন গমগম করছে। দলাই লামা কখন এসে পেঁাছবেন তারই জন্যে শুধু অধীর প্রতীক্ষা! ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল, এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনজিংকে। দলাই লামা দর্শনে তিনি সপরিবারে এসেছেন।

পুলিসের সশস্ত্র পাহারা চারদিকে। বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকবার সাধ্যি কারও নেই। সৌভাগ্যবান শুধু সাংবাদিকের দল আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশিষ্ট লোক। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের আই. জি.

শ্রীহীরেন সরকার, ডি. আই. জি. শ্রীপ্রসাদ বসু, আর ডি. আই. জি. শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত তারই তদারকিতে চরকির মত ঘুরছেন।

ইতিমধ্যে তেজপুর খালি করে দিয়ে বিদেশী সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানের দল হুড়মুড় করে শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে পেঁ ছিলেন। এই সকল 'কটা চুল নীল চক্ষু কপিশ কপোলে'র ভীড়ে 'যবন পণ্ডিতদের গুরু মারা চেলা' ধুতি পাঞ্জাবী পরা আমার মত দু-একজন সাংবাদিককেও দেখা যায়। আনন্দবাজারের হয়ে আমি এবং আমাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীশম্ভুদাস চ্যাটার্জি এইখানে এঁদের পিছন পিছন আছি।

পুলিসের তিন বড় কর্তা দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চের এক কোণে। মিঃ গুপ্ত আমাদের দেখে বললেন, "কি, বিদেশী কাগজগুলো তো আপনাদের টেক্কা মেরে দিল। খবরে, ছবিতে কাগজ প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছে।"

আমি বলি, "তা আমাদের কল্পনার দৌড় নিতান্তই পরিমিত। ওদের বিদ্যুৎগতি লেখনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সহজ কথা!"

মিঃ বসু এগিয়ে এসে বলেন, "দিয়ে দিন না গিয়াংসের এদিকে ফাঁড়িতে চিয়াংকাইশেককে দেখা গেছে। বিশ্বস্ত গোপনসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ থাকে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি হাসতে হাসতে বলি, "ভুল বললেন, বরং লেখা উচিত, একটি নির্ভরযোগ্য গুজবে জানা যায় যে—"

আই. জি. মিঃ সরকারও আমাদের হাসির কোরাসে যোগ দেন।

খানিক পরেই সিকিমের মহারাজকুমার মহারাজকুমারী আর মহারাণী এসে হাজির। গাড়িতে গ্যাংটক থেকে সোজা এসেছেন। তাঁদের পেছন পেছন এসেছেন দেওয়ান শ্রীরুস্তমজী আর সস্ত্রীক পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীআপ্পাসাহেব পন্থ। পন্থ আমাকে দেখে কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন। সেদিনের পরিচয় ভুলে যান নি তাহলে।

চলনে বলনে অত্যন্ত সপ্রতিভ সিকিমের মহারাজকুমার। চমৎকার ইংরেজী বলেন। এসেই মুভি ক্যামেরা বগলদাবা করে ছবি তুলতে লেগে গেলেন।

এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কি কি দিচ্ছেন দলাই লামাকে?"

বললেন, "তাঁর বাবা, মহারাজ অসুস্থ, তাই আসতে পারেন নি। তাঁর হয়ে দেবেন একখানি প্রার্থনা পুস্তক, বুদ্ধমূর্তি আর স্তূপ।"

"রেশমী উত্তরীয় 'খাদা' দেবেন না?"

"দেব বইকি। ওটা না দিলে চলবে কেন? তবে আমি যেটা দিচ্ছি ওর নাম 'খাদা' নয়, 'নাংজক'।"

"সেটা আবার কি?"

"খাদারই পরিবর্ধিত সংস্করণ। বলতে পারেন এক্সট্রা লং খাদা।" স্মিতহাস্যে বিদায় নিয়ে মহারাজকুমার ছুটলেন আবার ছবি তুলতে।

খানিক পর দলাই লামার আত্মীয়স্বজনরা দার্জিলিং থেকে এসে হাজির। দলাই লামার বড় ভাই থনডুপের স্ত্রী, বোন, ভাইপো, ভাগ্নের দল। এসেই সিকিমের দেওয়ান রুস্তমজী আর পন্থ সাহেবের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। রুস্তমজী এসেছেন সিকিমী জাতীয় পোশাক পরে। মাথায় জরীর টুপি, গায়ে ব্রোকেডের ফুল-হাতা জামা।

হঠাৎ সিকিমের মহারাজকুমার ছুটতে ছুটতে হাজির আমার কাছে। আমি এগিয়ে গেলাম।

"বলতে ভুলে গেছি, দলাই লামাকে সিকিমের তৈরী এক বাক্স অরেঞ্জ স্কোয়াশ আমরা দিচ্ছি। গরমে তাঁর ভাল লাগবে।"

হাসতে হাসতে আবার চলে গেলেন মহারাজকুমার।

দলাই লামার স্পেশ্যাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ঠিক সাড়ে নটায়। ট্রেন আসতেই কামরায় ঢুকলেন পন্থসাহেব, সিকিমের মহারাজ-কুমার আর আই. জি. হীরেন সরকার। আনুষ্ঠানিক প্রথায় উত্তরীয় বিনিময় হল কামরার ভেতরেই।

মিনিট দশেক পর দলাই লামা প্ল্যাটফর্মে পা দিলেন। ভুল হল, বলা উচিত আবির্ভূত হলেন। অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাস বাল্ব চোখ ধাঁধিয়ে একসঙ্গে জ্বলে উঠল। স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দেওয়া পুষ্পস্তবক হাতে নিয়ে দলাই লামা এগিয়ে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন আমাদের সামনে।

দলাই লামার গায়ে খয়েরী 'বাকু', পায়ে বাদামী জুতো, চোখে চশমা। আর মুখে স্মিতহাসি। সারা দেহে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই।

দলাই লামাকে নিয়ে যাওয়া হল মঞ্চের উপরে। পিছন পিছন এলেন দলাই লামার বুড়ী মা। আর ছোট ভাই নরি রিমপোচে, বড় ভাই থনডুপ আর ছোট বোন। দার্জিলিঙের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পেয়ে অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

দলাই লামা মিনিট দুই দাঁড়ালেন মঞ্চের উপরে। তাঁর চরণে নিবেদিত অসংখ্য 'খাদা' ছুঁড়ে দেওয়া হল চারদিক থেকে। দলাই লামা নীচে নেমে বেষ্টনীর চারধারে ঘুরলেন এবং 'দলাই লামা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি অসংখ্য ধ্বনির মধ্যে আবার ঢুকে পড়লেন কামরার ভিতরে।

মাত্র কয়েক মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এতদিনের উৎসাহ উত্তেজনার যবনিকাপাত হল। কিন্তু ভক্তদের জীবন সার্থক হয়েছে। জীবন্ত-বুদ্ধ ভগবান দলাই লামার দর্শন মিলেছে। দলাই লামার আশীর্বাদপূত একখানি শ্বেত উত্তরীয় আমার ভাগ্যেও মিলেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দলাই লামার পিছন ঘুরে ঘুরে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি। কামরার ভিতরে দু-চারজন তিব্বতীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। চেহারায়, পোশাকে, মাতব্বরগোছের যে দুজনকে মনে হল তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পেলাম না। একতরফা আলাপ কাঁহাতক চালানো যায়। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী

সবকিছু মিলিয়ে আমার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত অঙ্গভঙ্গির আশ্রয় নিই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং।' মাতব্বর ব্যক্তিদ্বয়ের শুধু আকর্ণবিস্তৃত মৃদু হাসি নিয়েই ফিরে এলাম। হাত নেড়ে বোঝালেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না।

এবারে গেলাম কুলিগোছের দুজন তিব্বতীর কাছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, হাত-পা নেড়ে আমি আর আমাদের ফটোগ্রাফার শম্ভুদা ওদের অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ফল হল না। এইটুকু মাত্র জানতে পারলাম, একজনের নাম সিনজে রাপতে, আর অন্যজন থাকে দ্রেপুং মঠে।

হঠাৎ দেখি, টেপরেকর্ডার, মুভি ক্যামেরা বগলে এক বিদেশী সাংবাদিক একজন তিব্বতীর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে দিয়েছে।

কে এই ভদ্রলোক?

এগোতেই চিনতে পারলাম। 'তিব্বতে সাত বছরে'র লেখক হাইনরিখ হারের। এমন চমৎকার তিব্বতী হারের ছাড়া আর কে বলতে পারে?

"আপনিই কি হের হারের?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"আপনার লেখা বই পড়েছি। ওয়াণ্ডারফুল বুক।"

"ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়টা তো পেলাম না?"

"সাংবাদিক। আনন্দবাজারের প্রতিনিধি।"

হঠাৎ সিকিমের মহারাণীকে দেখে হারের ছুটে গেলেন, জড়িয়ে ধরলেন মহারাণীর দু হাত।

সিকিমের মহারাজকুমারী ছিলেন আমার পাশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের রেস্তোরাঁয় মহারাজকুমারীর সঙ্গে আজই আমার আলাপ। বললাম, "হারের সাহেবকে চেনেন নাকি আপনারা?"

"বাঃ রে, চিনব না কেন? তিনি যে আমাদের অনেকদিনের বন্ধু।"

এদিকে এক ঘণ্টা পর দলাই লামার স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়ার হুইসিল বাজল। এবারে বিদায় নেবার পালা। দলাই লামা এসে দাঁড়ালেন কামরার খোলা দরজার সামনে। মুখে সেই পরিচিত স্মিত হাসি, হাতে নমস্কারের ভঙ্গি। জনতার অভিনন্দন নিতে নিতে তিনি এগিয়ে চললেন পশ্চিমের দিকে।

প্ল্যাটফর্মের গণ্ডি পার হতেই দেখা যায় দূর হিমালয়ের পাহাড়। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দলাই লামা নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন ওই পাহাড়ের নীল আর আকাশের নীলে মেশা উত্তরের দিকে।

হয়তো তাঁর মন চলে গিয়েছে গ্যাংটক, নাথু-লা, ইয়াতুং, ফাঁড়ি, গিয়াংসে ছাড়িয়ে লাসার দিকে। লাসা। তিব্বতের রাজধানী লাসা। দলাই লামার প্রিয় বাসভূমি লাসা। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী দলাই লামার ফেলে-আসা-দিনের অসংখ্য মধুর স্মৃতিতে ভরা লাসা—সেই লাসা আজ দলাই লামার কাছে বিদেশ।

দারুণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি কামনায় তিনি বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনের এই দুর্গম পথ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ইতিহাস তাঁকে কোথায়, কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাবে! আবার কি ফিরে যেতে পারবেন তাঁর প্রিয় বাসভূমি লাসায়!

দলাই লামার মুখের স্মিত হাসি মুছে গেছে। চোখের কোণে বিষাদের কালো ছায়া। ট্রেন এগিয়ে যায়।

দূর দুর্গম

'জিগু জি হের হারের' ?—জর্মন-বিদ্যের স্বল্প-পুঁজি উপুড় করে মাঝবয়সী দীর্ঘদেহীকে জিজ্ঞেস করলুম—"আপনিই কি মিঃ হারের ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো ?"

"আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

পরিচয়ের শুরু ঐটুকুতে। তারপর পুরো একটা দিন হারের সাহেবের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

আলাপের সূত্রপাত শিলিগুড়ি রেলস্টেশনে। লোকে গিজগিজ করছে স্টেশন। হাজার জাতের লোকের আনাগোনা, রঙবেরঙের পোশাক, ভিড়ের ঠেলাঠেলি। যেন কুম্ভমেলা। তেজপুর থেকে আসা মুসুরীগামী স্পেশ্যাল ট্রেন এইখানে থেমেছে। দলাই লামা জনতাকে দর্শন দিয়ে স্পেশাল ট্রেনের কামরায় এইমাত্র ঢুকেছেন। ট্রেন ছাড়ি-ছাড়ি করছে।

এমন সময় দেখি, রেলপ্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজের রেলিঙে হেলান দিয়ে দলাই লামার সঙ্গী এক তিব্বতীর সঙ্গে তিব্বতী ভাষাতেই অনর্গল কথা বলে চলেছেন এক বিদেশী ভদ্রলোক। অসংখ্য বিদেশী সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানের মাঝখানে ঐ মুখটি মনে হল বড় চেনা চেনা। ভদ্রলোকের গলায় ক্যামেরা, হাতে ক্যামেরা, বগলে ক্যামেরা। ফাউ একটা পোর্টেবল্ টেপরেকর্ডার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে খাকি প্যান্ট, বুশসার্ট। টিকলো নাক, চওড়া কপাল, চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। মাথার বাদামী চুল কমতে কমতে চওড়া কপালকে আরও চওড়া করে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছে।

ইনিই হের হাইনরিখ হারের। 'তিব্বতে সাত বছর' বইয়ের লেখক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে বৃটিশ-ভারতের জেল থেকে পালিয়ে চলে যান নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে। তিনি আর পিটার আউফশ্নাইটের। সেখানে দলাই লামার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মে।

তিব্বত ছেড়ে আসার বাসনা ছিল না। এমন সময় হঠাৎ কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণ। হারের পালিয়ে এলেন। তারপর গৃহস্থের জীবনযাপন করছেন নিজ-দেশ অষ্ট্রিয়ায়।

ঊনষাট সালের গোড়ার দিকে তিব্বতে শুরু হল বিপ্লব। চীনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট তিব্বতীর বিদ্রোহ। জীবনমরণ সংগ্রাম। দলাই লামা প্রাণ বাঁচাতে শতাধিক সঙ্গী নিয়ে গোপনে রওনা হলেন ভারতের দিকে। রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের আশায় জীবন্তবুদ্ধ দলাই লামাকে আশ্রয় দিল বুদ্ধের দেশ ভারত। ৩১শে মার্চ দলাই লামা সদলবলে সপরিবারে পৌঁছলেন ভারত-নেফা সীমান্ত তোয়াং। তোয়াং থেকে কামেং ডিভিশনে সদর দপ্তর বমডি-লা। বমডি-লা থেকে তেজপুর। তেজপুর থেকে মুসুরী। পথে শিলিগুড়ি।

দলাই লামার ভারত যাত্রার সংবাদ পেয়ে দেশবিদেশ থেকে ছুটে এলেন নামী নামী কাগজের বাঘা-বাঘা সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান। হারের তখন অষ্ট্রিয়ায়। হঠাৎ লণ্ডনের ডেলী মেল খবর পাঠাল ভারত যেতে হবে। তাঁদের কাগজের জন্যে পাঠাতে হবে গরম গরম খবর—খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'স্কুপ'। দলাই লামার সঙ্গে হারের পূর্বপরিচয় 'ডেলী মেল' কাজে লাগাতে চান। তাঁর সঙ্গে এলেন রোণ্ডা চার্চিল। হারের ইংরেজী ভাল লিখতে পারেন না। তিনি সংগৃহীত খবর বলবেন, চার্চিল লিখবেন, ছাপবে ডেলী মেল।

হারের আর চার্চিল তল্পীতল্পা বেঁধে,—থুড়ি ক্যামেরা-কলম বাগিয়ে চার্টার করা প্লেনে ছুটে এলেন তেজপুর। তেজপুর থেকে আবার সেই প্লেনেই শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে যাবেন মুসুরী। ফাঁকে ফাঁকে ভারতীয় ডাক বিভাগের সৌজন্যে তাঁদের পাঠানো গরম গরম খবর 'ডেলী মেলে'র প্রথম পৃষ্ঠা মাতিয়ে রাখছে।

আমিও 'আনন্দবাজারে'র প্রতিনিধি হয়ে এসেছি শিলিগুড়ি। দেশী বিদেশী সাংবাদিকের ভিড়ে উঁকিঝুঁকি মারছি। সঙ্গে স্টাফ-

যবনিকা—৪

ফটোগ্রাফার শ্রীশম্ভুদাস চ্যাটার্জি। আমাদের শম্ভুদা। হারেরের চেহারা চেনা ছিল। ছবি দেখেছি। তার উপর এমন চমৎকার অনর্গল তিব্বতী-ভাষা বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে হারের ছাড়া আর কে বলতে পারবে। আমার অনুমান-তীর লক্ষ্যভেদ করল।

হারেরকে জানালুম তাঁর 'তিব্বতে সাত বছর' বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

"ধন্যবাদ, কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলুম না।"—হারের আমার জর্মনবিদ্যের দৌড় বুঝতে পেরে ইংরেজীতেই বললেন।

বললুম, "আমিও একজন সাংবাদিক—কলকাতার বাংলা কাগজ 'আনন্দবাজারে'র।"

হারের 'আনন্দবাজার' জিনিসটা কি আন্দাজ করলেও বুঝতে পারলেন না। তাঁর আমতা-আমতা ভাব ঠাওর করে বললুম, "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডেরও বলতে পারেন। নাম শুনেছেন আশা করি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, গুড পেপার। দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার সঙ্গিনীর। ইনি হচ্ছেন রোণ্ডা চার্চিল, 'ডেলী মেলে'র সাংবাদিকা।"

টাইপরাইটার যন্ত্রধারিণী, 'নীলাক্ষী-ব্লন্দিনী' ইংরেজ নন্দিনীর সঙ্গে আমার অভিবাদন বিনিময় হল।

"আউফশ্নাইটের এখন কোথায়?"—হারেরকে জিজ্ঞেস করলুম।

"অনেকদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শুনেছি সে নেপালে।"

"তেজপুরে দলাই লামার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়েছে?"

"হয়নি। তবে দূর থেকে আমাকে দেখে চিনেছেন। আশা করছি মুসৌরীতে গিয়ে আলাপ করতে পারব।"

"আপনি তো দলাই লামার গৃহশিক্ষক ছিলেন কিছুদিন, তাই না?"

"ঠিক তা নয়, আমার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা জন্মেছিল; ঐটুকুই, আর কিছু নয়।"

ইতিমধ্যে দলাই লামার স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। দলাই লামা তাঁর কামরার দোরগোড়ায় একগাল হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। হারের ছুটে গেলেন ক্যামেরা বাগিয়ে। বললেন, "এখন চলি, পরে হয়তো দেখা হবে।"

শিলিগুড়ি টেলিগ্রাফ অফিসে হারেরের সঙ্গে আবার দেখা। উদ্দেশ্য তুজনের একই। টেলিগ্রাফে খবর পাঠানো।

"আরে, আপনি যে এখানে?"—হারেরের বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসা।

বললুম, "আমিও তো তাই বলতে চাই, আপনিও যে এখানে?"

"লণ্ডনে টেলিগ্রাফে খবর পাঠাব।"

"আমিও পাঠাব। কলকাতায়।"

তাকিয়ে দেখি টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে ছোট মাঠটার কিনারে এক ঢাউস মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে রোগা চার্চিল ত্বরিতগতিতে খটখট টাইপ করে যাচ্ছেন। অজস্র ইস্পাত-ফণার নিরন্তর ছোবল সাদা কাগজের সর্বাঙ্গে হরফের কালো বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। টাইপ-করা একটা পাতা নিয়ে হারের এসেছেন টেলিগ্রাফ-কাউণ্টারে। আমিও কাউণ্টারের এক পাশে সংবাদ রচনায় ব্যস্ত।

হারের বললেন, "আপনার কাজ হয়ে গেলে আসুন ঐ মাঠটায় বসে গল্প করি। অনেকক্ষণ এখানে থাকতে হবে। কমপক্ষে গোটা কুড়ি ফুলস্কেপ পাতার খবর পাঠাতে হবে। সবে এক পাতা হল। চার্চিল টাইপ করে দিচ্ছেন, আর আমি টেলিগ্রাফ কাউণ্টারের মধ্যে মাকু মারছি। এখানকার অফিসও যা ঢিমেতেতালা মনে হচ্ছে, ঘণ্টা তুই তিন লাগবে।"

আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম, "তাহলে তো চমৎকার হয়। দাঁড়ান, আমার লেখাও শেষ হয়ে এল। অফিসে একটা ট্রাঙ্ককল 'বুক' করে আসছি।"

তুজনে সামনের টাক-পড়া মাঠটায় যখন বসলুম, তখন সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ছটা। রাতের অন্ধকার নেমে আসছে। বিজলী

বাতির মিটমিটে আলো মফস্বল শহর শিলিগুড়ির ল্যাম্পপোস্টে ল্যাম্পপোস্টে জ্বলে উঠেছে। রাস্তার ওপাশে চায়ের দোকানে খুচরো কথার কলরব। সংবাদরচনায় একনিবিষ্ট-চার্চিলের টাইপযন্ত্রের শব্দ ঐ কলরব ছাপিয়ে এখানে ছুটে আসছে। সামনের পথে সাইকেল রিক্সার আর টেলিগ্রাফ কাউণ্টারে কয়েকজন লোকের আনাগোনা। মাঠের এধারে হারের আর আমি।

হারের বললেন, "কি খাবেন? বীয়র? আমার সঙ্গে রয়েছে।"

"ওরে বাপরে, সে পারব না।"

"তাহলে চা?"

"তাই ভাল। ঐ 'বীয়র' নামক তরল কুইনিন গেলার চেয়ে ঢের ভাল।"

চায়ের দোকান থেকে চা এল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি বললুম, "দেরাদুন জেল থেকে আপনার তিব্বত পালানোর গল্পটা শুনতে চাই।"

"সে তো 'তিব্বতে সাত বছর' বইয়ে লিখে দিয়েছি। আপনি তো পড়েছেন।"

"পড়েছি। কিন্তু আপনার মুখে শোনার সুযোগ যখন পেয়েছি, ছাড়ব কেন?"

"কিন্তু সে তো এক বিরাট কাহিনী, অনেক সময় লাগবে।"

"যতটুকু পারেন, ততটুকুই শুনব।"

"বেশ, শোনাচ্ছি। এদিক-সেদিক হলে 'তিব্বতে সাত বছর'টা মিলিয়ে নিতে পারেন। একটু দাঁড়ান, চার্চিলের বোধ হয় আর এক পাতা টাইপ হল। নিয়ে আসি।"

হারের ঢাউস গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"ছোটবেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতুম নতুন নতুন দেশে ছুটে চলার। পাহাড়ে চড়ার। বাড়ির কাছেই ছিল আল্পস পর্বত।

ভাবতুম, কবে ওর চূড়োয় উঠব।”—হারের ফিরে এসে তাঁর গল্প শুরু করেছেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

“তাছাড়া আমার শখ ছিল নানা রকমের খেলাধূলোয়। বিশেষ করে ‘শী’। ১৯৩৬ সালে অষ্ট্রিয়ার অলিম্পিক ‘শী’ টিমে স্থান পেয়ে গেলুম। ঐ ‘শী’ করার সময় গতির আনন্দ আমাকে মাতিয়ে তুলত। ভাবতুম, ঐ গতির টানে আমি দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব, জয় করব দুর্লঙ্ঘ্য প্রকৃতির বাধা-নিষেধকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় হিমালয়কে জয় করার সাধও এল। ইতিমধ্যে আল্পসের প্রত্যেকটি চূড়োয় চড়া শেষ হয়ে গিয়েছে।

“১৯৩১ সালে আমার কপাল খুলে গেল। যা চেয়েছিলুম তার একটা সুযোগ এসে গেল। খবর পেলুম, পিটার আউফশ্নাইটেরের নেতৃত্বে জর্মনী থেকে একটি নাঙ্গাপর্বত অভিযাত্রী দল ভারতের দিকে রওনা দিচ্ছে। আমি দলে ঢোকার জন্যে উঠে পড়ে লাগলুম। একদিন টেলিফোনে খবর এল, আমি দলে স্থান পেয়েছি। আমায় তখন পায় কে। হাতে স্বর্গ পেলুম। মালপত্র গুছিয়ে দলটির সঙ্গে চলে এলুম ভারতবর্ষ।”

একটা সিগারেট ফেলে আরেকটি সিগারেট ধরালেন হারের। তারপর পরপর দুটো সুখ-টান দিয়ে শুরু করলেন গল্প।

“হিমালয়ের দেশ ভারতবর্ষ। যে হিমালয় আমাকে বারবার ডাক দিয়েছে, যার চূড়োর নাগাল পাবার জন্য আমি আকুলিবিকুলি করেছি, সেই তুষারমৌলি নগাধিরাজের সন্তান ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে মনে হল, এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

“যাই হোক এদিকে আমরা প্রাথমিক কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলেছি। নাঙ্গা পর্বতে পৌঁছবার এক নতুন পথের সন্ধান মিলেছে। উদ্যোগপর্ব শেষ করে চূড়ান্ত অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হতে আমরা ইউরোপ ফিরে যাব ঠিক করছি। করাচী এলুম। প্লেনে রওনা হব। তখন ১৯৩৯ সালের জুলাই, না না, আগস্ট মাস।

“এদিকে ইউরোপের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো ছায়া।

যুদ্ধ লাগে লাগে ভাব। তার প্রভাব এসে পড়েছে ব্রিটিশ-ভারতে। আমাদের চারধারে গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা। দেখে আরও আশঙ্কিত হলুম।

"আউফশ্নাইটের ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক। তার ধারণা আর যুদ্ধ লাগবে না। সে ঠিক করল, করাচীতেই থাকবে। আমার কিন্তু মনে দারুণ ভয়,—যদি যুদ্ধ লাগে? যদি ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে যাই? ঠিক করলুম, জাল ছিঁড়ে পালাব। পারি তো হাঁটা-পথে ইরাণ হয়ে ইউরোপ। যা থাকে কপালে।

"হাতে সময় কম। আউফশ্নাইটেরকে ফেলে আমি আর দলের অন্য একজন—লোবেনহাইফের তার নাম—গোয়েন্দা পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে মরুভূমি ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে পৌঁছলুম লাস-বেলা। করাচীর উত্তর-পশ্চিমে এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে। কিন্তু এমনি বরাত—"

হারের সাহেব একটু থামতেই আমি বললুম, "ধরা পড়ে গেলেন তো? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' আপনারও বোধ হয় হয়েছিল তা-ই।"

হারের সিগারেটে টান দিতে দিতে আবার শুরু করলেন, "ঠিক বলেছেন, ধরা পড়ে গেলুম। লাস-বেলায় আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হল করাচী। একেবারে পুনর্মূষিক ভব। এসে দেখি, পিটার আউফশ্নাইটের অনেক আগেই ধরা পড়ে গিয়েছে। দুই বন্ধুর একই হাল।"

হারের ঢাউস গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, চার্চিল ডাকছেন, শুনে আসি।"

হারের সাহেব উঠে গেলেন। এমন সময় শুনি আমার ট্রাঙ্ক-কলের ডাক পড়েছে। তার-বাবু ডাকছেন। গিয়ে অফিসে কথাবার্তা বলে এলুম। তারপর দুজনে ফিরে আসার পর আবার শুরু হল গল্প।

"হ্যাঁ, যা বলছিলুম, আমার অনুমানই ঠিক। আমাদের ধরা

পড়ার দু'দিন পরই ইংলণ্ড জর্মনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আমরা শত্রুপক্ষ। আমাদের তো ধরবেই।

"যুদ্ধ ঘোষণার আধঘণ্টাটাক পরেই এক বন্দী-গাড়িতে তুলে আমাদের নিয়ে আসা হল এক ট্রান্‌জিট ক্যাম্পে। তারপর বোম্বাইয়ের আহমদ নগর। জেলখানা। রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। এ কোথায় এলুম। এ তো হিমালয়ের মুক্ত আকাশ নয়, এ যে বন্দীশালা। মিনিটে মিনিটে হাঁফ ধরে।

"সবাই মিলে ঠিক করলুম,—না, এ চলবে না। কারাগার আমাদের জন্যে নয়। পালাতেই হবে। যেমন করেই হোক। অনেক কষ্টে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গোপনে গোপনে টাকা, ম্যাপ, কম্পাস ইত্যাদি টুকিটাকি নানা জিনিস যোগাড় করলুম। রোজ চলল সলাপরামর্শ, ফন্দিফিকির।

"এমন সময় এক সুযোগও এসে গেল। হঠাৎ আমাদের নিয়ে আসার ঠিক হল দেওলালিতে। নতুন জেলখানায়। আমাদের চাপানো হল লরিতে। এক একটা লরিতে আঠারজন করে বন্দী। আর এক এক জন করে ভারতীয় সিপাই। আমাদের জিম্মাদার। দেখলুম সিপাইটির রাইফেল শেকল দিয়ে কোমরের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। যাতে অন্য কেউ রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। কনভয় চলেছে দেওলালি। সামনে পিছনে বন্দুকধারী প্রচুর সিপাই।

"আহমদ নগরে থাকার সময় আমি আর লোবেন হাইফের ঠিক করেছিলুম, নতুন শিবিরে পাঠানোর সময়ই আমরা পালাব। তাই আমরা দু'জন বসেছিলুম আমাদের লরিটার একেবারে পিছনে। বরাত ভালো রাস্তাটাও ছিল আঁকাবাঁকা। আর ছিল প্রচণ্ড ধুলো। ঠিক করলুম, সবার অলক্ষ্যে লরি থেকে লাফিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেব।

"চরম মুহূর্ত এল। উত্তেজনায় আমার রক্ত টগবগ করছে। এই তো একটা চমৎকার বাঁক এসে গেছে। গাড়ির গতিও একটু

কম। লোবেন হাইফেরকে চোখ দিয়ে ইসারা করলুম। এই তো সময়। আমি—"

হারেরের কথা শেষ না হতেই ঐ সময় অরসিকস্য অরসিক চায়ের দোকানের এক ছোকরা এসে হাজির, "বাবু, চায়ের দামটা।"

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। বেটা চায়ের দাম নেবার আর সময় পেল না। এমন এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে এসে রসভঙ্গ করতে হয়!

হারের জানতে চাইলেন—"কি চায় লোকটা?"

বললুম, "চায়ের দাম। দিয়ে দিয়েছি। আপনি আপনার গল্পটা বলুন। তারপর কি হল?"

"হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলুম"—হারের আবার খেই ধরলেন—"ভাবলুম এই তো সময় পালাবার। ধুলোর ঝড়ের ভিতর চোখ বুজে লাফ দিলুম। হুমড়ি খেয়ে পড়লুম রাস্তার গায়ে লাগা জঙ্গলে। আত্মগোপন করলুম ঝোপের আড়ালে। পায়ে লেগেছে ভীষণ চোট। কিন্তু উত্তেজনায় সব ব্যথা চাপা পড়ে গেছে। ভাবছি, লোবেন হাইফেরও হয়তো লুকিয়েছে অন্য কোন ঝোপে। আঃ, এখন মুক্তি।

"কিন্তু কি ব্যাপার! কনভয় থেমে গেছে যে! সান্ত্রী সিপাই এদিক ওদিক ছুটছে। তা হলে? তা হলে কি আমার পালানো ওরা দেখতে পেয়েছে? কিন্তু উঁহু, কারও দেখার কথা তো নয়, তাহলে বোধ হয় লোবেন হাইফেরই ধরা পড়েছে। ঠিক তাই। কি সর্বনাশ! তার সঙ্গে যে আমারও জিনিসপত্র, পালানোর সব সাজসরঞ্জাম। মরেছি, একা পালানোরও উপায় নেই। আবার কপাল পুড়লো। পোড়া বরাতকে গালাগাল দিতে দিতে চুপি চুপি চোরের মত লরিতে নিজের আসনে এসে ফের বসলুম। দেখি, যা ভেবেছি তাই; লোবেন হাইফেরের হাতে হাতকড়া। হতাশায় মন ভরে গেল।

"পরে শুনলুম লোবেন হাইফেরও ঠিক সময় লাফিয়েছিল। কিন্তু

সঙ্গের ভারী রুকস্যাক লাফ দেবার সময় শব্দ করে ওঠে। সেপাই শোনে। এবং জঙ্গলে আত্মগোপন করার আগেই তাঁকে পাকড়াও করে।”

হারেরের তখন গল্প বলার নেশায় পেয়ে গেছে; এক নাগাড়ে বলে চলেছেন—“দেওলালিতে কিছুদিন থাকার পর আমরা এলুম দেরাছুনের বন্দীনিবাসে। শহর থেকে মাইল কয়েক দূর। কাঁটাতারে ঘেরা। একটা দুটো বেড়া নয়, সাত সাতটা। কড়া পাহারা। পালানো বড় কঠিন। তবু আশা ছাড়িনি; যেমন করেই হোক মুক্ত হতে হবে। বন্দীনিবাসের কাছেই হিমালয়। ঠিক করলুম, একদিন না একদিন ঐ হিমালয়ের ভিতর দিয়েই তিব্বতে পালাতে হবে। তিব্বত নিরপেক্ষ দেশ, সেখানে আমার আশ্রয় মিলবেই। আর একদল সঙ্গী ভাবল ভারতের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বর্মা হয়ে জাপান চলে যাবে।”

শিলিগুড়ি শহরে ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। সামনের বটগাছটায় পাখীদের কিচিরমিচির। রাস্তার ক্ষীণ আলো, রাতের অন্ধকার, আর এই অপরিচিত বিদেশীর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর,—সব মিলে আমি চলে গিয়েছি অন্য এক জগতে। শিলিগুড়ি শহর, আনন্দবাজার অফিস, দলাই লামা সব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে।

হারের ডান পাশে, বাঁ পাশে সিগারেটের টুকরোর জঞ্জাল ক্রমেই বাড়ছে। হারের আর একটা সিগারেট ধরালেন। মাঝে আর একবার টেলিগ্রাফ কাউন্টার ঘুরে এসেছেন। তারপর আমার অনুরোধের কোন অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলেন।

“বন্দীনিবাসে শুরু হল কঠিন সাধনা। জাপানী, তিব্বতী, হিন্দুস্থানী শিখতে লেগে গেলুম। পড়তে লাগলুম এশিয়া সংক্রান্ত ভ্রমণ পুস্তক। জেলের লাইব্রেরীতে ছিল অনেক বই। আমার পলায়ন পথের কয়েকটি রুটের ম্যাপ নকল করে রাখলুম। তার মধ্যে বাছাই করে করে একটি রুট ঠিক করা হয়ে গেল। দিনের

বেলা পড়াশোনা, গবেষণা; আর রাত্রে লক্ষ্য করতুম প্রহরীদের চাল-চলন, আচরণ। পালানোর সময় কাজে লাগবে।”

“কেউ সন্দেহ করেনি?”—আমার জিজ্ঞাসা।

“সন্দেহ করার সুযোগ দিইনি”—হারের জানালেন। তারপর বললেন, “গোড়ায় ভেবেছিলুম, একাই পালাব। কিন্তু একদিন আমার বন্ধু রোলার ম্যাগেনার এসে বলল, ‘একজন ইতালিয়ান জেনারেলও আমার মত পালাতে চায়।’ রাত্তির বেলা আমি আর ম্যাগেনার হাজির হলুম ওই জেনারেলের ক্যাম্পে। আমার সঙ্গী ঠিক হয়ে গেল। তার নাম মার্চেজ। সে-ই ইতালিয়ান জেনারেল। বছর চল্লিশেক বয়স। রোগা, শক্ত গড়ন।

“গোড়ায় মুশকিল বেধে গেল। সে বলে ইতালিয়ান, আমি বলি জর্মন। মহা ফ্যাসাদ। একজন আর একজনের কথা ভাল বুঝতে পারি না। দুজনেই জানি সামান্য ইংরেজী। কিছু ফরাসী। তাই দিয়ে কাজ চালাতে হবে।”

আমি আবার জিজ্ঞেস করি—“কিন্তু এতদূর পালাতে গেলে তো টাকার দরকার। টাকা যোগাড় করলেন কোত্থেকে?”

হারের বললেন, “টাকার কোন অসুবিধে ছিল না। মার্চেজ ব্রিটিশ জেনারেলের মাইনে পেত। তাই টাকার সমস্যাও রইল না। ঠিক হল, সে দেবে টাকা, আমি দেব প্ল্যান। গোপন পরামর্শ চলল। ওর ক্যাম্পে যেতে আসতে কাঁটাতার ডিঙনোর কায়দাও জেনে গেলুম।

“তখন ১৯৪৩ সাল। প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হল। একদিন রাত্তিরে আমি মার্চেজের ঘরে এলুম কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে। মার্চেজের সঙ্গে হাত মেলালুম। এবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

“অন্ধকার নেমে এসেছে পাহাড়ের বুক ঘিরে। বন্দীনিবাসের চারদিকে। দূরে দেখা যাচ্ছে, উঁচু পাহাড়ের আবছা ছায়া। মাঝে মাঝে জোনাকির আনাগোনা। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। মাঝরাত।

"প্রহরী বদলের আর দশ মিনিট বাকী। সামনে এক মই তৈরী। অধীর উৎকণ্ঠায় কয়েক মিনিট কাটল। উত্তেজনায় আমার রক্ত টগবগ করছে, বুক ধড়ফড় করছে।

"প্রহরী দুজন কাছাকাছি এল। দুজন দুদিকে চলে গেল। এই তো সুবর্ণসুযোগ।"

হারেরের গল্পের আবার এক সংকটজনক মুহূর্তে হঠাৎ পিছন থেকে ডাক—'অমিত অমিত।' এ যে শম্ভুদার গলা! কি কাণ্ড! শম্ভুদা আর আমাকে ডাকার সময় পেল না! মনে মনে দারুণ রাগ হল! কিন্তু বাইরে যথাসম্ভব মোলায়েম গলাতেই বললুম, "এই যে শম্ভুদা, আসুন, আমি এইখানে।"

"আরে, তোকে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান, টেলিগ্রাফ অফিসের বাইরে ভেতরে কোথাও নেই। হঠাৎ দেখি, মাঠে তোর মত একটা লোকের ছায়া। আন্দাজে ডাক দিলুম। কি করছিস এখানে?"—শম্ভুদার তিতিবিরক্ত গলা।

আমি তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে হারেরের সঙ্গে শম্ভুদার পরিচয় করিয়ে দিই।

"হের হাইনরিখ হারের আর মিঃ চ্যাটার্জি—আমাদের স্টাফ-ফটোগ্রাফার। হের হারের আমাকে তাঁর তিব্বত পালানোর গল্প বলছেন, শুনতে চান তো বসে পড়ুন।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই শম্ভুদা বসে পড়েছে। তিনি নিজেও আড্ডাবাজ মানুষ। গল্প পেলে আর কোথায় যাবেন। বসেই হারেরকে উদ্দেশ করে বলেন, "আপনার সঙ্গে আগে একবার আমার দেখা হয়েছিল।"

"কোথায় কোথায়?"—হারেরের ত্বরিৎ-জিজ্ঞাসা।

"গ্যাংটকে। আপনি যখন চীনা আক্রমণের সময় তিব্বত ছেড়ে পালিয়ে আসেন সেই সময়। দলাই লামা লাসা ছেড়ে ভারতের দিকে আসছেন খবর পেয়ে অফিস থেকে আমি এবং আর একজন স্টাফ-রিপোর্টার তখন কালিম্পং আসি, ছবি তোলা, খবর নেবার

জন্যে। কালিম্পং গ্যাংটকে অনেক দিন রইলুম। দলাই লামা আর এলেন না। লাসায় ফিরে গেলেন। আর আমরাও অনর্থক কয়েকটা দিন নষ্ট করে কলকাতা ফিরে গেলুম। সেই সময়ই আপনি গ্যাংটক হয়ে ভারতে এসেছিলেন। তখন অবশ্য আলাপ হয়নি—"

শম্ভুদার কথা শুনে হারের সাহেব মৃদু হাসলেন। আমি তখন অধৈর্য হয়ে পড়েছি। এক বিচ্ছিরি জায়গায় এসে গল্প থেমে গেছে। হারেরকে বলি—"তারপর কি হল ?"

"কিসের ?"—হারের অন্যমনস্ক ভাবে বলেন।

"কিসের আবার, দেরাদুন জেল থেকে পালানোর !"—আমার যেন তর সইছে না।

"কদ্দূর এসে থেমেছি যেন"—হারের ভুলে গেছেন কোথায় এসে গল্প থেমেছে।

আমি বলি, "ওই যে প্রহরী দুজন দুদিকে চলে গেল—"

"হ্যাঁ, প্রহরীরা তো দুদিকে চলে গেল—"

হারেরের মনে পড়েছে—"হাতে সময় নেই, এক সেকেণ্ড অনর্থক দেরী করার উপায় নেই। আমি মই বেয়ে উঁচু কাঁটা-তারের বেড়ার উপর উঠলুম। তার কাটলুম। মার্চেজ এক পাশে তারগুলো সরিয়ে দিল। আমি লাফিয়ে এক বাড়ির ছাদে পা দিলুম। আমার পেছন পেছন মার্চেজের আসার কথা। সে এল না। কি মুশকিল ! প্রহরী এদিকে এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। আমি রেগে-মেগে হিঁচড়ে টেনে তাকে আমার কাছে নিয়ে এলুম। তারপর বিরাট এক লাফ। দৌড়। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। জোরে। আরও জোরে। পেছনে শুনছি প্রহরীর চীৎকার। গুলীর শব্দ। দৌড়। আরও, আরও জোরে দৌড়। আবার গুলীর শব্দ। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া ছাড়া সে গুলী আর কিছু করতে পারল না। আমরা তখন নাগালের বাইরে। অনেক দূরে। আঃ, কি আনন্দ !"

হারেরের গল্প বলার ধরন দেখে শম্ভুদাও জমে গেলেন। তাঁর সিগারেটে টান দেবার কায়দা দেখে মনে হল, গল্পের নেশা তাঁকেও ধরেছে। হারের তখন গল্পের দৌড়ও পুরোদমে চালিয়েছেন।

"দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু থামলুম। মার্চেজ আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তখন আনন্দ প্রকাশের সময় নয়। প্রহরীরা হয়তো পিছু ধাওয়া করেছে। আমাদের আরও দূরে পালাতে হবে। সোজা রাস্তা ছেড়ে দিলুম। দৌড়তে লাগলুম জংলী রাস্তা ধরে।

"হাঁফ ধরে গেছে। কয়েক মাইল দৌড়নোর পর মনে হল, বিপদ কমেছে। একটু জিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম। আজ রাত্রের মধ্যেই আমাদের নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হবে। পথে পড়ল একটা গ্রাম। গ্রামের লোকেরা তো আমাদের দেখে ভয় পেয়ে ঢাক পিটোতে শুরু করল। কারণ একে মাঝরাত, তার উপর আমাদের চামড়া সাহেবের। অথচ সঙ্গে কুলি নেই, নিজের মাল নিজেই বইছি। ভেবেছে একটা গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। আমরা গ্রামের পথ ছেড়ে অন্য পথে ছুটলুম।

"এই সময়ই আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলি, প্রথম দিকটায় পালাব রাত্রিবেলা, দিনের বেলা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকব। রাত্রে গ্রামের লোকের উৎপাত ততটা হবে না। তবে তার চেয়েও বড় উৎপাত অবিশ্যি আছে। বাঘ ভালুকের উৎপাত। কিন্তু দেরাদুনের সেই বন্দীশালার গহ্বরে ঢোকার চেয়ে বাঘ ভালুকের পেটে ঢোকা ঢের ঢের ভাল।"

ইতিমধ্যে রোগা চার্চিলের ডাকে হারের গাড়ির কাছে গিয়ে কি একটা জিনিস বুঝিয়ে এসে ফের গল্প চালালেন।

"ভোর হয়ে এল। উত্তেজনা আর পথশ্রমের ক্লান্তির পর চরম অবসাদ। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে এখন বিশ্রাম। জঙ্গলের ভিতর। সারাদিন এই ভাবেই কাটল। সঙ্গে ছিল কিছু খাবার আর এক বোতল জল।

"আবার নেমে এল রাতের অন্ধকার। এখন আর দেরি নয়। পালাবার জন্যে দুজনে তৈরী হলুম। আমাদের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর অভ্রভেদী হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

"পাহাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে উঠলুম। নীচে, একটু দূরে তাকিয়ে দেখলুম দেরাদুন বন্দীনিবাসের ক্ষীণ আলো। সেই মুহূর্তে বড় বেশী করে মনে হতে লাগল, আমি মুক্ত, আমি আজ মুক্ত।

"জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম মুক্তির আনন্দ কি রকম! কিন্তু আনন্দে অধীর হবার সময় এ নয়। অজানা পথ দিয়ে ম্যাপ সম্বল করে আমাদের এগোতে হবে। সামনে চড়াই।

"এবারে এক কায়দা করলুম। আগেই ঠিক করা ছিল। সঙ্গে মেক-আপের কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলুম। কালি-ঝুলি মেখে মেখে গায়ের সাদা চামড়া কালো করলুম। যাতে কেউ আমাদের সাহেব না ভাবতে পারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব আমরা তীর্থযাত্রী।

"সন্ধ্যের আধো-অন্ধকারে নীচে নেমে মাঠের মাঝখানে কয়েকজন চাষীর সঙ্গে দেখা। ওরা আমাদের দেখে দাঁড়াল। আমরা কোন কথা না বলে ভালমানুষের মত দ্রুত এগোতে লাগলুম।

"তারপর একটানা যাত্রা। পথের যেন শেষ নেই। পাহাড় ডিঙিয়ে যমুনা নদীর কাছাকাছি পোঁছলুম। ততক্ষণে রাত নেমেছে। আমাদের প্ল্যান হল, যমুনা নদী বরাবর এগোব, সেখান থেকে গঙ্গোত্রী হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে পোঁছব।

"সেদিন মার্চেজ বড় ক্লান্ত। একেই রোগা মানুষ, তার উপর এই কঠিন পরিশ্রম। আমি তাকে কর্ণফ্লেক তৈরী করে খাওয়ালুম। ভেবেছিলুম এখানেই রাত কাটাব। লোকবসতিও কম। কিন্তু বাপ রে, কি পিঁপড়ে! কামড়ে কামড়ে উত্ত্যক্ত করে মারল। থাকা গেল না। গা ঢাকা দিয়ে এগোতে লাগলুম।

"এদিকে আমার সঙ্গীটির অবস্থা কাহিল। ক্রমেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার মাল নিজের কাঁধে চাপালুম। আমি শক্ত

মানুষ, আমার কোন অসুবিধে হল না। মার্চেন্জ বোধ হয় মনে মনে আমাকে শাপশাপান্ত করছে আর ভাবছে, কেন এই বিপদের ঝুঁকি নিতে গেলাম রে বাবা। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি পিছোবার আর উপায় নেই। পিছনে দেরাদুনের বন্দীনিবাস আমাদের গেলার জন্যে বিরাট হাঁ মেলে আছে।

"পরের দুটো রাত উজান ঠেলে চড়াই বেয়ে বেয়ে এগোলুম। একবার কয়েকজন জেলের সঙ্গে দেখা। আমাদের প্রশ্ন করতেই ভাঙা হিন্দুস্থানীতে মাছ কিনতে চাইলুম। মাছ দিল। স্টোভে ভেজে খেলুম। ওদের কাছ থেকে বিড়ি দুটোও চেয়ে নিলুম। আমি মনের আনন্দে বিড়ি টানতে লাগলুম। ওদের মনে কোন সন্দেহ রইল না। মার্চেন্জ কিন্তু বিড়িতে এক দম দিয়ে নাকাল। খক খক করে কেশে হয়রান।

"আবার পথ চলা। আবার চড়াই। পরদিন সকালবেলা বড় অসুবিধে হল। ফাঁকা মাঠ। ধান ক্ষেত। গা ঢাকা দেবার জায়গা নেই। নানা রকম লোক এসে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। মহা মুশকিলে পড়লাম। তীর্থযাত্রী বলে বলে ওদের হাত থেকে কোনক্রমে ছাড়া পেয়ে বিশ্রামের আশা বাদ দিয়ে চড়াই ভাঙতেই শুরু করলুম। ঢুকে পড়লুম এক ঘন বনে। ভাবলুম, বাঁচা গেল, ঘুমোতে পারব স্বস্তিতে। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল, ছোট এক রাখাল ছেলে আসছে। 'ধুত্তোর' বলে তল্পিতল্পা বেঁধে আবার যাত্রা শুরু করলুম।

"পরের রাত জনবিরল উপত্যকা দিয়েই চলেছি। সঙ্গের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। একটা ভুল করে ফেললুম। দেখি, কাছাকাছি এক ডোবা। তৃষ্ণাকাতর আমি ঢক ঢক করে ডোবার জল খেয়ে ফেললুম। কিন্তু তার পরেই কি বমি, কি বমি। প্রাণ যায় যায়। অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পর ধড়ে প্রাণ এল।

"যাই হোক, বারোদিনের দিন এল চরম সংকট। আমরা এসেছি গঙ্গার তীরে। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, লম্বা মাঠ, উঁচু পাহাড়,

নদী, নালাবিল কত কিছু না অতিক্রম করেছি। হিংস্র বন্যজন্তুর খপ্পরে পড়িনি ঠিকই, কিন্তু বিপদ এসেছে একটার পর একটা। তার বিস্তারিত বর্ণনা দেবার সময় এ নয়। দিলে সারারাত কাবার হয়ে যাবে। এদিকে আমার সঙ্গীটির অবস্থা কাহিল। অস্থি-কঙ্কালসার চেহারা, চেনা যায় না এ মার্চেজ—ইতালিয়ান জেনারেল। এ যেন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশের কোন লোক, কিংবা যক্ষ্মারোগী। অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে বেচারা ধুঁকছে। বড় কষ্ট হল। আমিও শ্রান্ত, ক্লান্ত। তবে ততটা কাহিল হইনি। সঙ্গের খাবারও ফুরিয়ে গেছে।

"পথে এক চায়ের দোকান পড়ল। কেরোসিন বাতির মিটমিটে আলোয় রাত্রিবেলা দোকানের ঝাঁপ খোলা। চারদিকে কালো অন্ধকার। ঘন বন। গায়ে কালিঝুলি মেখে লুকিয়ে ঐ দোকানে চা খেয়েছি। একদিন তো দোকানী আমাদের চোর ভেবে দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল। তাতে আমি খুশীই হই। আমাদের ছদ্মবেশ তাহলে ভালই হয়েছে।

"পরদিন টাকা বাজাতে বাজাতে দোকানীর কাছে এলুম। বললুম—'দশজনের খাবার কিনতে চাই।' দোকানী রাজী হল। পেট ভরে খেয়েদেয়ে দিনটা ভালই কাটল। কিন্তু হায়, সুখের পালা বুঝি আবার সাঙ্গ হল। কাঠকুড়োনিদের উপদ্রবে পড়লুম। মার্চেজ তখন গরমের চোটে গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। প্রায় নগ্ন। চেহারাও কঙ্কালসার। তাছাড়া আমরা তীর্থযাত্রীদের কুটিরে আশ্রয় নিইনি। ওদের সন্দেহ হল। ওরা আমাদের গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। আমি মার্চেজের শরীরের দোহাই দিয়ে যেতে চাইলুম না। ওরা চলে গেল। বাঁচলুম।

"কিন্তু হায় ভগবান, কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা আবার ফিরে এল। আন্দাজ করেছে ঠিকই। বলল, 'মনে হচ্ছে, তোমারা পালিয়ে এসেছ। নগদ টাকা ফেল, নইলে ধরিয়ে দেব।'

"পুরোপুরি ব্ল্যাকমেলিং।

"আমিও নাছোড়বান্দা। বললুম—'উঁহু, সে হবে না। কেন আমাদের বিরক্ত করছ। আমি কাশ্মীরের একজন ডাক্তার।'

"হুমকিতে কাজ হল। ওরা চলে গেল। কিন্তু সে রাত কাটল বড় ভয়ে ভয়ে। বুক কাঁপছে। যদি ধরা পড়ে যাই?

"এ জায়গা ছেড়ে অনেক কষ্টে উত্তর কাশীতে পৌঁছলুম। দূরে মন্দিরের আলো। এখানেই 'ইনার লাইন'। ক্রশ করতে হলে 'পাশ' দরকার। পুলিস ফাঁড়িও আছে। যতই এগোই, ততই লোকবসতি কমছে। আছে শুধু ভুটিয়া আর তিব্বতী ব্যবসায়ীদের ক্যাম্প। আমরা তখন প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে।

"একদিন এলুম ভারতেই এক পাহাড়ী গ্রামে। নাম নেলাং। সে গ্রামে গ্রীষ্মকালে লোক থাকে। শীতকালে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। পথে পড়ল নদী। অনেক কষ্টে পার হলুম। পড়ল আরও একটা নদী। জোড়াতালি দেওয়া এক সাঁকো পার হতে গিয়ে মার্চেজ পড়ে গেল অথৈ জলে। আমি লাফিয়ে পড়ে ওকে টেনে তুললুম। আগুন জেলে ওর শরীর গরম করলুম। ওর অসহায় অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল কেন ওকে নিয়ে এসেছিলুম। একা এলেই ভাল হত।

"যাই হোক, সামনে এগোলুম। আমার কাঁধে ভর করে ধুঁকতে ধুঁকতে মার্চেজও এগোচ্ছে। খানিক দূর যাই, আর বিশ্রাম নিই। আমার জন্যে নয়, মার্চেজের তাগিদে। কি বিপদেই না পড়া গেছে।

"অনেকক্ষণ হাঁটার পর চেয়ে দেখি, আমাদের সামনে এক ভারতীয় ভদ্রলোক। ফিটফাট চেহারা। সঙ্গে জনাদশেক সেপাই। ভদ্রলোক চোস্ত ইংরেজীতে আমাদের 'পাশ' চাইলেন।

"আমরা ভান করলুম—যেন তাঁর ভাষা বুঝিনি। আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলুম আমরা তীর্থযাত্রী, কাশ্মীর থেকে এসেছি।

"ভদ্রলোক বললেন—'কাছেই এক বাড়িতে দুজন কাশ্মীরী আছেন। তাঁরা যদি বলেন তো ছেড়ে দেওয়া হবে।'

"হায় ভগবান, এই মুহূর্তে এমন বেয়াড়া জায়গায় দুজন কাশ্মীরী আবার থাকতে গেল কেন? ওরা না থাকলে কী ক্ষতিটাই বা হত এই পৃথিবীর? ভেবেছিলুম—এখানে অন্তত কোন কাশ্মীরী থাকবে না।

"আমি হাল ছেড়ে দিলুম।

"কাশ্মীরী দুজন বন্যাবিশেষজ্ঞ। এখানে সরকারী কাজে এসেছেন। এঁদের সামনে দাঁড়াতেই মনে হল, এবার চরম সর্বনাশ, ছদ্মবেশ এখনি খসে পড়বে।

"আগেই বলেছি, মার্চেজ আর আমি অল্প ফরাসী জানতুম। আমি ফরাসীতে মার্চেজকে একটা কথা বললুম। সর্বনাশটা পুরোপুরি হয়ে গেল। ঐ ভারতীয় ভদ্রলোকটি তখন ফরাসীতেই কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। হায় রে, গোটা পৃথিবীটাই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে কেনই বা কাশ্মীরী লোক এল, আর কেনই বা এই ভদ্রলোকটি ফরাসী জানতে গেলেন।

"ভদ্রলোক ফরাসীতে বললেন—'আপনারা কে ঠিক করে বলুন। নইলে বিপদ হবে।'

"কূলে এসে তরী ডুবল। সমস্ত আশাভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীকার করলুম—'আমরা পলাতক বন্দী।'

"আমাদের নিয়ে আসা হল এক চমৎকার 'বাংলো' প্যাটার্ন বাড়িতে। চা-ও এল। কিন্তু হতাশায় ভরা মন নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছে করছে না। জেল ছাড়ার পর আঠার দিন কেটেছে। এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছিলুম না। সব কপাল।

"পরে জানলুম ভদ্রলোকটি তেহরি গাড়োয়াল রাজ্যের বন-বিভাগের কর্তা। তিনি ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন অনেক ভাষা জানেন। সরকারী কাজে এখানে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এইভাবে আমাদের ধরে ফেলার জন্যে

তিনি দুঃখিত। ভদ্রলোকের বিনয় তো নয়, যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

"ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি কিন্তু মনে মনে আবার পালানোর কথা ভাবছি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মার্চেজ হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাকী টাকা সব আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, আমি আর নয়।

"সন্ধ্যেবেলা জানালুম, আমরা শ্রান্ত, ঘুমোতে চাই। বাইরে থেকে আমাদের শোবার ঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোক বারান্দায় বিছানা পাতলেন। আমরা যাতে পালাতে না পারি।

"আমার মাথায় তখন এক দারুণ ফন্দী এসেছে। মার্চেজের সঙ্গে পরামর্শ করলুম। ঠিক হল, আমি আর মার্চেজ তালামারা ঘরের ভিতর 'নকল-ঝগড়া' চালাব। আমাকে ঝগড়ায় যোগ দিতে হবে না। মার্চেজ একবার চড়া গলায়, একবার নীচু গলায় গালাগাল দেবে। যাতে মনে হবে আমরা দুজনেই ঝগড়া করছি।

"'নকল-ঝগড়া' শুরু হয়ে গেল। সাবাস মার্চেজ। চমৎকার অভিনয় করছে। চড়ায়, খাদে ঘরের ভেতর গালাগালির ধুম পড়ে গেল। টের পেলুম ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণের জন্যে অন্য জায়গায় গেছেন। এই সুযোগে আমি জানালা টপকিয়ে সামনের বারান্দা দিয়ে দৌড় দিলুম। পোঁ-পোঁ দৌড়। চারদিকে অন্ধকার। মিশে গেলুম সামনের জঙ্গলে। মার্চেজ তখনও নকল-ঝগড়া চালাচ্ছে। যেন ঘরের ভিতর আমরা দুজনেই আছি,—একে অন্যকে গালাগাল দিচ্ছি।

"আমি দৌড়োচ্ছি আর ভাবছি, মার্চেজ এখনও নকল ঝগড়া চালাচ্ছে আর ভদ্রলোকটি বাইরে পাহারা দিচ্ছেন। মনে মনে হাসলুম। দিন যত খুশি পাহারা। আমি এখন তাঁর নাগালের বাইরে।

"অনেকক্ষণ চলার পর মনে হল, আমি ভুল পথ ধরেছি। তাই

ঠিক পথে আসতে গিয়ে কয়েক মাইল পিছিয়ে আসতে হল। বেআন্দাজ ঘোরাঘুরির জন্যে পাক্কা চারটি ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে ভোর হয়েও আসছে।

"হঠাৎ সামনে বিশ গজ দূরে দেখি, ওরে বাপ রে—একটা ভালুক। থমকে দাঁড়ালুম। উফ, বাঁচা গেল, ভালুকটা আমায় না দেখে চলে গেল। শ্বাসপ্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হল। কি বাঁচাটাই না বেঁচেছি।

"ভোরের আলো ফুটতেই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। আবার রাতের অন্ধকার এল। আবার যাত্রা শুরু। ম্যাপটা দেখে নিলুম। ম্যাপ মত একটা তিব্বতী গ্রাম পাবার কথা। কিন্তু কি ব্যাপার, গ্রামটা পাচ্ছি না কেন? তাহলে হয়তো আরও সামনে আছে। এগোলুম।

"না, বরাত আমার সত্যি সত্যিই খারাপ। আবার ভুলপথে এসেছি। যে পথ দিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম, সেই পথেই আমি এগোচ্ছি। এবং যথারীতি আবার গ্রেপ্তার হতে হল। আমি পালিয়ে যাবার পর একদল লোক আমাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছিল। পড়ে গেলুম তাদের খপ্পরে।

"ফেরার বাকী পথটুকু আরামেরই হল। পথে মার্চেজও জুটল। মার্চেজ আমাকে দেখে হাসল। আমিও হাসলুম কষ্টের হাসি।

"ফেরার পথে একজন ভারতীয় চাষীর সঙ্গে ভাব হয়েছিল; তার কাছে আমার ম্যাপ কম্পাস আর টাকা এক ফাঁকে গোপনে জমা রাখলুম। কানে কানে বললুম, 'বন্ধু, আগামী বসন্তে আমি আবার আসব।' তখন আমার জিনিস নিয়ে যাব। সে রাজী হল।

"আমি তখনও পালানোর আশা পুরোপুরি ছাড়িনি।

"তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বড় দুঃখের কাহিনী। ফের কাঁটাতারের বেড়া, ফের দেরাদুনের বন্দীনিবাস। মন্ত্রচালিতের মত বন্দীনিবাসের ভিতর প্রবেশ করলুম। অন্যান্য বন্দীরা আমাদের

ছজনের চেহারা দেখে চিনতে পারল না। এতদিনের পরিশ্রমে, উত্তেজনায় আমরা যেন অন্য মানুষ।"

হারের এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি, আরও শুনবেন? রাত বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু—"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, আরও শুনব।"—দ্বৈতকণ্ঠে বলি শম্ভুদা ও আমি।

"সব কথা, সব ঘটনা পুরোপুরি মনেও নেই।"—হারেরের থেমে যাবার অছিলা।

"যা মনে আছে, তাই বলুন। তা ছাড়া আপনার এখানকার কাজও তো শেষ হয়নি। আরও অনেক স্লিপ টেলিগ্রাম করার বাকী আছে না?"—আমার নাছোড়বান্দা গলা।

"তা বটে।"—হাল ছেড়ে দিয়ে হারের হাসতে হাসতে বলেন। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "আটটা বাজে বাজে।"

"তা হোক, আপনি বলুন।"—আমি হাল ছাড়ি না।

"আচ্ছা, দাঁড়ান, আসছি।"

চার্চিলের ডাকে একটা স্লিপ পৌঁছে দিয়ে হারের শুরু করলেন, "ইংরেজ কর্নেল বললেন, আটাশ দিনের 'সলিটারি কনফাইনমেণ্ট'। জেল পালানোর শাস্তি। মার্চেজেরও তাই।

"শাস্তি শেষ হবার পর মার্চেজ একদিন আমাকে জানাল, সে আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী আছে, কিন্তু নিজে আর পালাবে না, দারুণ শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বন্দীনিবাস আমার জন্যে নয়। তিব্বত আমাকে ডাকছে। আমাকে পালাতেই হবে।"

"আপনার দারুণ মনের জোর তো!"—শম্ভুদা ফোড়ন কাটলেন।

"ওইটেই আমার চারিত্রিক লক্ষণ। আমি বার বার পরাজিত হয়েও ভেঙে পড়ি না।" হারের শম্ভুদার কথার জবাব দিয়ে দেরাছনের বন্দীনিবাসে ফিরে গেলেন :—

"আবার তোড়জোড় চলল। গতবারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমি এবারে সফল হবই। শীত পেরিয়ে গেল। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আমিও পলায়নের জন্যে প্রস্তুত। এবারে ঠিক করেছি আগেই বেরুব। লেনাং গ্রাম জনবসতিহীন থাকতেই পার হব। তাছাড়া ওই ভারতীয় বন্ধুটির কাছ থেকে আমার জিনিসপত্র ফেরত নিতে হবে।

"এদিকে আরও কয়েকজন বন্দীও পালাবার তোড়জোড় করছে। রোল্ফ্-ম্যাগেনার আর হাইনস-ফন-হাভে ঠিক করল বর্মা দিয়ে পালাবে। পিটার আউফশ্নাইটের, ব্রুনো ট্রাইপেল, হান্স্ কোপ এবং স্যাটলার আমার মতই তিব্বত পালানোর কথা ভাবছে।

"১৯৪৪ সালের ২৯শে এপ্রিল। দুপুর দুটো। এই সময়েই পালাবার সময় ঠিক হল। 'জিরো আওয়ার'।

"আমাদের সাতজনের প্ল্যান হল, কাঁটাতার মেরামতি স্কোয়াডের ছদ্মবেশ নেওয়া। এই রকম স্কোয়াড প্রায়ই আসত জেলে। কারণ উইপোকা কাঁটাতারের খুঁটিগুলো খেয়ে ফেলত। আর ওইগুলি বারবার পালটাতে হত। স্কোয়াডে থাকত একজন ইংরেজ অফিসার আর কয়েকজন ভারতীয়।

"নির্ধারিত দিনে আমরা এক ঘরে জড় হলুম। জেলের অন্য একজন লোক আমাদের এমন চমৎকার 'মেক-আপ' করে দিল যে, বোঝবার উপায় নেই,—আমরা ইউরোপীয়,—ভারতীয় নই। হাভে ও ম্যাগেনার নিল ইংরেজ অফিসারের ড্রেস। আর আমরা মাথা কামিয়ে পাগড়ি পরে সাজলুম ভারতীয়। এত উত্তেজনার মধ্যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে, এবং একে অন্যের চেহারা দেখে না হেসে থাকতে পারলুম না। খাসা 'মেক-আপ' হয়েছে।

"দুজনের হাতে মই। কয়েকজনের হাতে কাঁটাতার। টুকি-টাকি জিনিসপত্র বাঁধা হল এক একটি ছোট পুঁটলিতে। নকল ইংরেজ অফিসারের এক হাতে ব্লু-প্রিন্ট, অন্য হাতে ছড়ি।

"আমরা রওনা হলুম। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে সদর

ফটকের কাছাকাছি এলুম। সদর ফটক আর তিন শ গজ দূর। লোকজন নেই। হঠাৎ সাইকেল চড়ে এল একজন সার্জেন্ট। এই রে সেরেছে, ধরা পড়ে গেলুম। বুঝি ? না, বাঁচা গেল। সার্জেন্টটি আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

"আমাদের অফিসাররা তখন কাঁটাতারের বেড়া পরীক্ষা করছেন। আমরা কয়েকজন ফটক দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলুম। সবার শেষে ছিল স্যাট্‌লার। তার একটু দেরী হল। অফিসার দুজনও বেরিয়ে এলেন। স্যাটলারও এল। প্রহরীরা আমাদের দিকে নজর দিল না।

"উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিটি মুহূর্ত। না জানি কি হয়! নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। কিন্তু অভিনয় চালিয়ে যেতে হচ্ছে। আমরা স্বাভাবিকভাবেই এগোচ্ছি। প্রহরীরা তখন চোখের আড়াল।

"বাস্, আর আমাদের পায় কে ? দৌড়ে ঢুকে পড়লুম জঙ্গলে। খুলে ফেললুম ছদ্মবেশ, বেরিয়ে পড়ল ভেতরের খাকি পোশাক।

"অল্প দু-একটা কথা সেরে আমরা যে যার পথ ধরলুম।

"হাভে, ম্যাগেনার আর আমি একসঙ্গে একই পথে কয়েক মাইল দৌড়লুম। তারপর বিদায় নিয়ে ওরা দুজন অন্য পথে চলে গেল। এবারেও আমি ঠিক করেছি এগোব রাত্তিরে, দিনে এক পাও নয়। এবং আর কোন ঝুঁকি নেওয়া নয়। আবার যদি বন্দীনিবাসে ফিরে যেতে হয়, তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু।

"আমি আগেকার রুটেই চললুম। আমার সারা গায়ে কাটার দাগ, পা ছড়ে গেছে, টেনিস শু্য ছিঁড়ে গেছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়বার সময় কোনদিকে খেয়াল ছিল না।

"পথে এগোতে আবার অনেক বিপদ, অনেক অভিজ্ঞতা। নানা ধরনের লোক আসে। কোনক্রমে কাটাই। দিনের বেলা আড়ালে বিশ্রাম নেবার সময়ও দু-একজন এসে পড়ে। একবার একদল হনুমানের পাল্লায় পড়ে অনেক কষ্টে ওদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।

"দিন যায়। রাত যায়। দিনের বেলা বিশ্রাম, রাত্রে বিরামহীন যাত্রা। একদিন এক ভারতীয়কে আমার কাছে আসতে দেখে আমি ভয়ে ভয়ে অন্য পথ ধরলুম। প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড় ধরলুম। সেদিন বড় কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আর কারও খপ্পরে পড়তে আমি রাজী নই।

"কিন্তু তাও পড়তে হল। মানুষের নয়, জন্তুর। হঠাৎ সামনে এক চিতাবাঘ। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। 'টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট'। বাস্, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। গায়ের রোম খাড়া। হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। শুধু একটা বড় ছোরা।

"চিতাটা পনেরো ফুট উঁচু এক গাছের ডালে। লাফ দেয় লাফ দেয় ভাব। ওই ডালের তলা দিয়ে আমায় যেতে হবে। দু পাশে ঘন বন। যা থাকে কপালে। ছোরাহাতে হাঁটি হাঁটি পা পা এগিয়ে চললুম।

"যাক বাবা, কিচ্ছু হল না। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তারপর সোজা দৌড়। পিছনে তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই। এগোচ্ছি, আর মনে হচ্ছে, কে যেন আমায় তাড়া করছে।

"চিতাটা কিন্তু আসলে আমায় দেখতেই পায়নি।

"জঙ্গল ঠেলে একটু ভাল পথে নামলুম। আবার আর এক দফা বিস্ময়। তাকিয়ে দেখি, পথের মাঝখানে কয়েকজন লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আরে, এ যে আউফশ্নাইটের দল! ওরাও এসে পড়েছে এ পথে!

"ওদের জাগিয়ে হৈ হল্লা লাগিয়ে দিলুম। আমাদের মনমেজাজ তখন খুশীতে চাঙ্গা। একসঙ্গে বিশ্রাম। তারপর যে যার পথে।

উত্তর কাশীতে আবার বিপদ। দুজন লোক আমার পিছু নিল। আমি দৌড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলুম। লুকলুম দুই পাথরের আড়ালে। বিপদ কাটার পর ভয়ে ভয়ে সামনে এগোলুম।

"কি চমৎকার রাত। চাঁদের আলো ধুইয়ে দিচ্ছে গাছপালা,

মাঠ, বন। উঁচু গাছের ফাঁকে নীল আকাশের কোণে গোলাকার আলোকবৃত্ত। দেখে দেখে আশ মেটে না।

“এসে পৌঁছলুম সেই ভারতীয় চাষীর বাড়িতে। তখন মে মাস। গুটিসুটি বাড়িতে ঢুকে আস্তে আস্তে লোকটির নাম ধরে ডাকলুম। সে বেরিয়ে এল, আমার হাত ধরল, চুপিচুপি কাঠের আলমারি থেকে আমার সব জিনিস হাতে তুলে দিল। আমি খুশীতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম।

“তার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে সঙ্গে নিলুম কিছু খাবার, গরম কম্বল। এই লোকটির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। এমন বিশ্বস্ত লোক আর হয় না।

“পরদিন চলার পথে মাঝরাতে মাঝপথে এক ভালুক। গোঙাচ্ছে। কি বিপদ রে বাবা! আমাকে দেখছি কেউ স্বস্তিতে এগোতে দেবে না। ভালুকটার চোখে চোখ রেখে পিছু হটতে লাগলুম। একটা বাঁক ঘুরে এক টুকরো কাঠে আগুন ধরিয়ে এবার শত্রুর মুখোমুখি হলুম। এক হাতে ছোরা, এক হাতে আগুন। এসে দেখি, ভালুকটা নেই। পরে জেনেছি, ভালুকরা রাতে ভয় পায়, দিনের বেলা আক্রমণ করে।

“দশ দিন হাঁটার পর নেলাং। এই সেই নেলাং। যেখানে গতবার আমার সব আশাভরসা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সব প্ল্যান বানচাল হয়ে যায়। এবারে আমি মাসখানেক আগে এসেছি। শীত এখনও আছে। তাই লোকজন নেই সেখানে। এসে দেখি, বন্দীনিবাসের পলাতক আমার আরও চার বন্ধু। আমি যখন আমার ভারতীয় বন্ধুটির বাড়িতে খাওয়াদাওয়ায় দেরী করছি, ততক্ষণে ওরা এগিয়ে গেছে। গ্রামের এক ফাঁকা বাড়িতে সবাই রাত কাটালুম। স্যাটলারের শুরু হল পাহাড়ী অসুস্থতা—মাউন্টেন সিকনেস। ভীষণ ব্যাপার। সে ঠিক করল ফিরে যাবে; কিন্তু প্রতিশ্রুত হল আরও দুদিন পর সে আত্মসমর্পণ করবে। ততক্ষণে

আমরা পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়ে এগিয়ে যেতে পারব। কোপ আমার সঙ্গী হল।

"ভারত-তিব্বত সীমান্তের এক গিরিপথে পৌঁছতে লাগল সাতদিনের হাঁটা। এখানে আসার সময় এক পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে প্রথম দেখি আমার স্বপ্নের দেশ তিব্বত—যে তিব্বত আমায় ডাক দিয়েছে।

"আঠার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। অক্সিজেন ছাড়া বড় কষ্ট হচ্ছিল। নেমে এলুম। তারিখটা মনে আছে, ১৯৪৪ সালের ১৭ই মে।

"গিরিপথের কাছে তিব্বতের প্রান্তে এসে নিরাপত্তার ভাব এল। কারণ কোন ইংরেজ আর আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কি আনন্দ। তবে তিব্বতীরা আমাদের কিভাবে নেবে জানি না। ভালভাবেই নেওয়া উচিত, কারণ ওদের সঙ্গে তো আমাদের লড়াই নেই।

"আশেপাশে দেখলুম, অনেক প্রার্থনা-পতাকা। হাওয়ায় পত পত্ করে উড়ছে। জায়গাটা ভীষণ ঠাণ্ডা। ভাবলুম, টাকা সঙ্গে কম, খাবারও ফুরিয়ে এসেছে, এদেশের ভাষাও জানিনে, কি হবে কে জানে।

"ভীষণ খিদে পেয়েছে। অনেকদিন কিছু খাইনি। তাড়াতাড়ি খাবার না পেলে মারা পড়ব। অথচ কাছাকাছি কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই। কি করি?

"ম্যাপ দেখে এক গ্রামের সন্ধান পেলুম। আমাদের যাত্রাপথ হচ্ছে প্রথমে কৈলাস পর্বত, তারপর ব্রহ্মপুত্র বা সাংপো নদী বরাবর পূর্ব তিব্বত। কোপ বলল, ম্যাপ ঠিক আছে। আমরা ভুল পথে আসিনি।

"গিরিপথ থেকে নামলুম উপত্যকায়। কিন্তু লোকজন কোথাও নেই। এদিকে খিদেয় নাড়িভুঁড়ি চোঁ চোঁ করছে। খাবার পেটে না পড়লে হাঁটাও চলবে না। পেটে খিল মেরে আর কাঁহাতক খিদের জ্বালা এড়ানো যায়। দুজনে শুধু জিব দিয়ে ঠোঁট চাটি।"

"এখন বোধ হয় আপনার খিদে পেয়েছে। অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করছেন।"—আমি হারেরকে জিজ্ঞেস করি।

"না না, মোটেই খিদে পায়নি।"

"তবে আর এক কাপ চা খান। চায়ের শহর শিলিগুড়ি, চা দিয়েই এখানে আপনাকে আপ্যায়ন করি।

"বেশ, তাই হোক।"—হারের সম্মতি দিলেন। শম্ভুদা হাঁক দিয়ে আরও তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

"পরদিন দুপুরের আগেই পৌঁছলুম এক গ্রামে। নাম কাসাপুলিং। মাত্র ছ'খানা বাড়ি। তাও লোক নেই। এক বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিলুম। কোন সাড়া নেই। কি ব্যাপার? পরে নজর পড়ল মাঠের দিকে। গ্রামের সবাই মাঠে বার্লির চারা পুঁততে ব্যস্ত। যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে।

"আমরা বাড়ির দোরগোড়ায় বসে রইলুম। খাবার না নিয়ে নড়ব না। সন্ধ্যে নাগাদ লোকজন এল। এসে আমাদের ভূতুড়ে মার্কা চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। অনেক কষ্টে আমরা বোঝালুম, ভূত নই, মানুষ; শত্রু নই, বন্ধু। দাম দিয়ে ছাগল বা ভেড়া যাহোক একটা কিছু কিনতে চাইলুম। রাজী হল না। বিদেশী সম্বন্ধে এরা শত্রু-ভাবাপন্ন—যাকে বলে 'হোস্টাইল।' বিদেশীর কাছে কোন জিনিস বিক্রি করলে কঠোর শাস্তি।

"কিন্তু আমরা ক্ষুধার্ত। ছলেবলেকৌশলে যেমন করেই হোক খাবার যোগাড় করতে হবে। ঠিক করলুম বিক্রি না করলে জবরদস্তি করে নিয়ে যাব; যা থাকে কপালে। হম্বিতম্বি শুরু করতেই কাজ হল। অত্যন্ত চড়া দামে এক বুড়ো ছাগল বিক্রি করল। তাই সই। খিদের কাছে বুড়ো ছাগল চড়া দাম কিছুই লাগে না। মাঝরাত্তিরে আধপোড়া মাংস খেলুম পরম তৃপ্তিতে। আঃ, কি সুস্বাদু এই বুড়ো ছাগলের আধপোড়া মাংস।

"পরদিন ওই গ্রামেই কাটালুম। বাড়িগুলো পাথরের। লোকজন ভীষণ নোংরা। বড় বেয়াড়া জায়গা। প্রথম পাওয়া

গ্রামের আপ্যায়ন দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত হতে পারলুম না।

"ভোরে গ্রাম ছাড়লুম। কোপ আবার মজাদার মজাদার কথা বলে হাসাতে লাগল। পেটে খিদে নেই, জিরিয়েও নিয়েছি। রসিকতা উপভোগ করা চলে। পৌঁছলুম আর একটা উপত্যকায়। সামনেই হিমালয়। কামেং গিরিশৃঙ্গের সাদা চূড়ো। কি সুন্দর দেখাচ্ছে হিমালয়কে। নীচের দিকে নামতে নামতে পেঁীছলুম তুশাং গ্রামে। দুপুরবেলা। আগের গ্রামটির মতই লোক কম, আতিথেয়তারও বালাই নেই। আউফশ্লাইটের আর আমি তিব্বতী ভাষার দু-চারটে শব্দের পুঁজি সম্বল করে অঙ্গভঙ্গীতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, হাত-পা নেড়ে গ্রামবাসীদের আমাদের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল। কেউ কেউ সরে পড়ল।

"এখানেই প্রথম দেখলুম তিব্বতী মঠ। পুরনো ভাঙা বাড়ি। মাত্র কয়েকজন ভিক্ষুর বাস। কে জানে একদিন হয়তো এই মঠেই শত শত ভিক্ষুর আস্তানা ছিল। কিন্তু এই অপরিচিত অসহযোগী ভয়সঙ্কুল দেশে তখন বড় অসহায় বোধ করতে লাগলুম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেলুম নিজেদের ছোট তাঁবুতে। গ্রাম থেকে একটু দূরে।

"তুশাংয়ে এমন কোন কর্মচারী পেলুম না, যার কাছে আমাদের তিব্বত ভ্রমণের পারমিট পাওয়া যেতে পারে বা আবেদন করা যেতে পারে।

"পরদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার চলেছি। সামনে আমি আর কোপ। পিছনে আউফশ্লাইটের আর ট্রাইপেল। হঠাৎ শুনি টাট্টু ঘোড়ার গলার ঘণ্টা। ঢং ঢং ঢং। ঘোড়ায় চড়ে দুজন লোক এসে হাজির। ওদের ভাষায় কি একটা বলল। কিছুই ঠাওর করতে পারলুম না। এবারে ওদের অঙ্গভঙ্গী করার পালা। পরে বুঝলুম, বলতে চাইছে, 'আমরা যেন এই রাস্তা ধরে ভারতে ফিরে যাই।'

"ভাবলুম তর্ক করে লাভ হবে না। আমরা চারজন, ওরা দুজন। এক্ষেত্রে গায়ের জোর খাটানো চলে। কোন কথা না বলে মারলুম লোক দুটোকে জোর ধাক্কা। নীচে গড়িয়ে পড়ল। পাল্টা আক্রমণের কোন সুযোগই দিলুম না।

"আমরা এগিয়ে চললুম। এবং দূর থেকে দেখলুম লোক দুটো গাঁইগুঁই করতে করতে চলে যাচ্ছে। ঠিক হয়েছে।

"আমরা যেদিকে চলেছি, সেখানে এক স্থানীয় রাজকর্মচারী থাকার কথা। নির্জন প্রাণহীন উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা পৌঁছলুম ৎসাপারাং। ছোট শহর। অবশ্য নামেই শহর। গ্রামও নয়।

"এ জায়গায় লোকজন থাকে শীতকালে। গ্রীষ্মকালে অন্যত্র চলে যায়। আমরা যখন রাজকর্মচারীটির খোঁজ করছি, তখন শুনলুম, তিনি নাকি এ জায়গা ছেড়ে শাংগাৎসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ির দিকে গেলুম।

"মহামান্য রাজকর্মচারীকে দেখে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। যে দুজনকে আমরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলুম, তিনি তাঁদেরই একজন।"

হারেরের সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুদা ও আমি দুজনেই হেসে উঠলুম।

বলাই বাহুল্য আমাদের অভ্যর্থনাটা তেমন সুখকর হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। হারের ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "অনেক কাকুতিমিনতি করলুম, মাফ চাইলুম। কিন্তু হাওয়া অনুকূল হল না। শেষমেষ আমি আমার বোঁচকা থেকে কিছু ওষুধ বের করে তাকে দিতে চাইলুম। বিনিময়ে কিছু ময়দা। চিড়ে ভিজল। অর্থাৎ সুরটা কিছু নরম হল। আমাদের দেখিয়ে দিলেন গুহা মতন একটা জায়গা, সেখানেই রাত কাটাতে পারি।

"ভাগ্যিস আমার সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল। কাজ দিল। পরেও এই ওষুধের বাক্স বিপদে অনেক কাজ দিয়েছে।

"তিনি বলে দিলেন 'ওইখানে রাত কাটিয়ে ভারতবর্ষে চলে যাও। এখানে থাকা চলবে না, কিংবা এগনোও চলবে না।'

"আমরা আমাদের পরিচয় দিলুম। তিব্বত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সুতরাং আশ্রয় দিতে বাধা কি। এতগুলো কথা বোঝাতে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। দুটো তিনটে তিব্বতী কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী। আমাদের কাকুতিমিনতিতে চিড়ে আরও কিছুটা ভিজল। বললেন, তার পক্ষে চূড়ান্ত মত দেওয়া সম্ভব নয়। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূর থুলিং। সেখানে আরও বড় একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করলে ব্যবস্থা পাকা হবে।

"পরদিন থুলিং। সেই রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করলুম। কোন লাভ হল না। অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতিতেও না। ভদ্রলোকের এক কথা—ফিরে যাও।

"এদিকে আবার খিদের জ্বালা। বললেন, ভারতবর্ষে ফিরতে রাজী হলেই খাবারদাবার বিক্রি করা হবে, নইলে নয়। খিদের জ্বালায় মুখে রাজী হয়ে গেলুম। একগাদা টাকা খরচ করে মাখন আর মাংস কিনলুম। আগে তো খাওয়াদাওয়া করা যাক, তারপর দেখি কি করা যায়।

"আমরা শাংগাৎসে ফিরে যেতে রাজী হলে আমাদের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে চারটে গাধা সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। পেট পুরে খেয়েদেয়ে রওনা হলুম। সঙ্গে কোন প্রহরী ছিল না। শুধু গাধার সঙ্গের লোক। প্রহরীর অবশ্য দরকারও নেই। খাবার-দাবার কেউ বিক্রি না করলেই 'বাপ বাপ' বলে কথামত কাজ করব। খিদের জ্বালা বড় জ্বালা।

"শাংগাৎসেতে লোকজন কম। ছোট গ্রাম। ছ সাতটা বাড়ি। মাটির তৈরী। ৎসাপারাংয়ের সেই কর্মচারীটির সঙ্গেও দেখা হল। তিব্বত যাবার অনুমতি মিলল না। ভারতবর্ষেই ফিরে যেতে হবে। বললেন—শিপ্‌কি গিরিপথ দিয়ে ভারত যেতে পারি। এবং রাজী হলেই খাবারদাবার বিক্রী করা হবে।

"আমরা শিপ্‌কি গিরিপথের রুটই বেছে নিলুম। ভাবলুম পরে ন থেকে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। আপাতত মাখন াংস ময়দা কিনে নেওয়া যাক। পরে কাজে লাগবে।

"আউফশ্লাইটের একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আরও দুদিন াকার অনুমতি চাইলুম। কর্মচারী রাজী হলেন না। াউফশ্লাইটেরকে নিয়ে যাবার জন্যে এক টাট্টুঘোড়া দিলেন। ার দিলেন মাল বহার জন্যে তিব্বতী চমরি গাই। এই প্রথম চমরি াই দেখলুম।

"অনেক গ্রাম, অনেক গুহা পার হতে লাগলুম। আমাদের াধার জিম্মাদার লোকটি লাসা থেকে এসেছে। খাসা লোক। ামাদের সারা পথ মাতিয়ে রেখেছে। আঁকাবাঁকা পথে উঠছি, ামছি, উঠছি। এই চলছে মাঝে মাঝে, পেরোচ্ছি সরু গিরিকন্দর। ারুণ সুন্দর পথ। বেশ শীত।

"আমরা ক্রমেই ভারত সীমান্তের দিকে এগোচ্ছি। আস্তে াস্তে শীত কমছে। যে জায়গাটিতে এলুম সেখান থেকেই শতদ্রুর রু। ওয়েসিসের মত গ্রাম। সুন্দর এপ্রিকটের বাগান।

"শাংগাৎসে থেকে এগার দিন পর শিপ্‌কি গ্রামে এলুম। ৯ই ন। তিন হপ্তার বেশী ঘুরছি ফিরছি, এগোতে পারছি না। পেকি গ্রামে এক এপ্রিকট বাগানের ভিতর রাত কাটালুম। এপ্রিকট পাকা ছিল না, নইলে খেয়ে নিতুম গোটাকতক।

"এইখানেই আশী টাকা দিয়ে এক গাধা কিনলুম। বললুম, রত যেতে মাল বইবে। মনে মনে ভাবলুম, প্ল্যান মত পালাতে লে একটা গাধার দরকার।

"'আবার হয়তো লাসায় দেখা হবে'—বলে আমাদের সঙ্গী ামুদে লোকটি চলে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম। তিব্বতী া ভারতীয় কোন সীমান্ত ঘাঁটি নেই এখানে। শুধু পাথর আর প্রার্থনা-পতাকা। আর সভ্যতার একটি মাত্র চিহ্ন—একটি াইন বোর্ড। তাতে লেখা—সিমলা ২০০ মাইল।

"আবার ভারত? আবার সেই দেরাদুনের বন্দীনিবাস
কাঁটাতারের বেড়ার দুঃস্বপ্ন? না, ওপথে আর নয়। আমাদে
সম্মুখে একটি মাত্র পথ খোলা—সে পথ তিব্বতের। যত বিপদই
আসুক, যত লাঞ্ছনাই হোক, আমাদের পৌঁছতে হবে লাসায়
সাহসে বুক বাঁধলুম। চল লাসায়।"

"ভারতের দিকে মুখ ফেরালুম। চোখের সামনে হিমালয়
তুহিতা তিব্বতের বিস্তৃত জনপদ। আমাদের দৃষ্টি ওই দিকেই।

"ভেবে দেখলুম, ছোটখাট রাজকর্মচারীদের তিব্বত প্রবেশের অনুমতি দেবার এক্তিয়ার নেই। ওদের মতামতে কিছু এসে যায় না। আমাদের পাকড়াও করতে হবে আরও বড় কাউকে তার জন্যে যেতে হবে গারতোক—পশ্চিম তিব্বতের সদর দপ্তর সেখানে আছেন স্থানীয় গবর্নর। তিনি যা হোক একটা ব্যবস্থ করতে পারবেন।

"ব্যবসায়ীদের একটা রাস্তা ধরে কয়েক মাইল চললুম। প
পড়ল সীমান্তের এক ভারতীয় গ্রাম। সেখানে তেমন অসুবি
হল না। বললুম, আমরা ভারত থেকে আসছি না, আসছি তিব
থেকে। নিজেদের পরিচয় দিলুম মার্কিন সৈন্য বলে। কিন
দীর্ঘ পথের কিছু রসদ।

"তারপর আমরা চারজন দু দলে ভাগ হয়ে গেলুম। আউ
শ্লাইটের আর ট্রাইপেল অন্য পথ নিল। আমি আর কোপ স্পি
উপত্যকার দিকে রওনা হলুম। সঙ্গে নবক্রীত সেই রাসভনন্দ
হিমালয়ের বুক চিরে আমরা এগিয়ে চললুম। লোকজন কোথ
নেই। কারও সঙ্গে দেখা হলে বলি, আমরা তীর্থযাত্রী, কৈল
পর্বতে চলেছি।

"পথে পড়ল প্রথম তিব্বতী গ্রাম ক্যুরিক। মাত্র দুটো বাড়ি
তারপর আর একটা গ্রাম। নামটা ঠিক মনে নেই। বেশ ব
গ্রাম। সেখানে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই বললুম, আমরা এ

ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দল, লাসা সরকারের অনুমতি নিয়েই ঢুকেছি। কেউ আপত্তি করল না। আমরা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চললুম।

"কয়েক দিন এইভাবে যাবার পর দুজনেরই অবাক হবার পালা। কি আশ্চর্য, আউফশ্নাইটের আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

"'হে পিটার'—চীৎকার করে উঠলুম দুজনে।

"আউফশ্নাইটের বলল, সে এখন একা। ট্রাইপেল ভারতবর্ষে ফিরে গেছে। অনেক কষ্টে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে। ভাগ্যি ভাল, আমাদের এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছে।"

হারের এবারে আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি তো আপনাকে কি সুন্দর বলে যাচ্ছি ঘটনাগুলো। কিন্তু কার্যত তা এত সুন্দর, এত সহজ হয়নি। কি দারুণ কষ্ট গেছে ঐ সকল জায়গা পেরোতে, কল্পনা করতে পারবেন না। এখনও গা শিউরে ওঠে। একে কনকনে ঠাণ্ডা, তার উপর চড়াই। হাজার হাজার ফুট। ঐ গারতোক পৌঁছতেই আমাদের দম বেরিয়ে যায়।

"গারতোকে পৌঁছতে আরও পাঁচ দিন লাগল। চমৎকার জায়গা। চারদিকে নানা রঙের বাহার। দেখে চোখ জুড়োয়। পথে দেখা হয়েছিল দু-চারজন তিব্বতী ব্যবসায়ীর সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে মালবোঝাই গাধা দেখে অনেকে ভাবল, আমরাও বোধ হয় ব্যবসায়ী। কেউ কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, আমরা কোন জিনিস বিক্রি করব কি না।

"ম্যাপ আর ভূগোলের বই পড়েই জানি গারতোক পশ্চিম তিব্বতের সদর দপ্তর। জায়গা দেখে হেসে বাঁচি না। এই নাকি সদর দপ্তর। যাযাবরদের কয়েকটি তাঁবু আর মাটিতে তৈরী কয়েকখানা বাড়ি। পথে দু-চারটে কুকুরের আনাগোনা।

"কাছাকাছি বয়ে যাচ্ছে নালা মতন একটি নদী। নাম গার্তাং।

সিন্ধু নদের শাখা। সেখানেই আমাদের ছোট্ট তাঁবু পাতলুম। ঘণ্টা কয়েক পর কয়েকজন লোক এল। ওদের কাছ থেকেই জানলুম, বড় দু'জন রাজকর্মচারীই 'শহরে' নেই। আছেন তাঁদের সামান্য একজন প্রতিনিধি। তাঁর কাছেই আমাদের আবেদন পেশ করতে হবে।

"তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি, ছোট্ট একটা কুঠরী মতন ঘর। মাথা নিচু করে কোমর বেঁকিয়ে কোনক্রমে ঘরে ঢুকতে হয়। ভেতরে বসে আছেন জবুথবু একজন লোক। অদ্ভুত পোশাক। কানে ইয়া বড় মাকড়ি। এদিকে আমাদের পিছনে একপাল বাচ্চা ছেলে ভিড় জমিয়েছে। কিম্ভূতকিমাকার তিনজন বিদেশীকে দেখে এদের কৌতূহলের সীমা নেই।

"সবিনয় নিবেদনে আমাদের বসতে বলা হল। আপ্যায়ন করা হল শুক্‌নো মাংস, মাখন আর চা দিয়ে। আমাদের কথাবার্তা চলল খানিকটা অঙ্গভঙ্গী আর খানিকটা ইংরেজী-তিব্বতী অভিধানের পাতা নেড়ে-চেড়ে। হৃদ্যতার অভাব ছিল না। মনে হল, আমাদের আশা পূর্ণ হবে। বললুম, আমরা 'পলাতক জর্মন, নিরপেক্ষ তিব্বতের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাই।'

"পরদিন ঐ প্রতিনিধির জন্যে উপহার হিসেবে নিয়ে এলুম কিছু ওষুধপত্র। ভদ্রলোকটি খুশী হলেন, ব্যবহারের বিধিও শিখিয়ে দিলুম। এবং এই দুর্বল মুহূর্তে আমাদের আর্জি পেশ করলুম। বললুম, আমরা ট্রাভেল পারমিট চাই। উত্তরে তিনি বললেন যে, চেষ্টা করবেন, তবে তাঁর প্রভুর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি গেছেন তীর্থযাত্রায়। কৈলাস পর্বতে। কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরবেন।

"অপেক্ষা করতেই হল। ঐ কয়েক দিনের মধ্যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের ভাব জমে গেল। তাঁকে টুকিটাকি অনেক কিছু উপহার দিলুম। বিনিময়ে তিনিও কিছু মাখন আর ময়দা উপহার

পাঠালেন। এমন কি ভদ্রলোকটি একদিন সভৃত্য আমাদের তাঁবুতেও এসে হাজির।

"কিন্তু অবাক কাণ্ড, সেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোকটির আচরণ একদম পালটে গেল, এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন আমাদের চেনেনই না।

"একদিন রাজকর্মচারীটি সস্ত্রীক সদলবলে এসে পৌঁছলেন বিরাট শোভাযাত্রা করে। চাকরবাকর লটবহরের এক লম্বা লাইন। পোশাকেরও কি বাহার। রেশমী কাপড়ের রোশনাই, রঙে রঙে ছয়লাপ। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলুম। শোভাযাত্রা প্রথমে গেল এক বৌদ্ধমঠে। সেখানে নিরাপদ তীর্থযাত্রার জন্মে প্রার্থনা করা হল।

"আউফশ্নাইটের ইতিমধ্যে একখানা আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছে। আবেদন পাঠানো হল। কিন্তু জবাব না আসায় নিজেরাই হাজির হলুম রাজকর্মচারীর বাড়িতে। দেখা করলুম। বললুম আমাদের অসুবিধের কথা, আর্জির কথা। তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন। আমাদের ভাঙা ভাঙা তিব্বতী ভাষা শুনে তাঁকে মুচকি হাসতেও দেখা গেল। তাঁর পারিষদরা তো হেসে কুটিকুটি। বুঝলুম হাওয়া অনুকূল। তিনি জানালেন, অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমরা কিছু উপহার দিয়ে চলে এলুম। তিনিও পরে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন।

"পরদিন তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ। এইদিন একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বসেছেন এক বিরাট আসনে। অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে। আমাদের বললেন, তাঁর যতখানি এক্তিয়ার ততখানি অর্থাৎ 'ঙারি' প্রদেশ পর্যন্ত যাবার পারমিট তিনি দিচ্ছেন তবে তিব্বতের আরও ভিতরে যাবার অনুমতি তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলুম। বললুম, নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণের পারমিট দিলেই আমরা খুশী। খানিক দ্বিধার পর তিনি রাজী হলেন। বললেন, লাস

সরকারের কাছে আমাদের আর্জি পেশ করবেন। তবে তার উত্তর আসতে আসতে কয়েক মাস। কিন্তু ততদিন এখানে থাকতে আমরা নারাজ। আমাদের যেমন করেই হোক পুব দিকে এগোতে হবে।

"তিনি বললেন, দিন কয়েক অপেক্ষা করতে। গাইড সঙ্গে দিয়ে দেবেন। তিনদিন পর পাশ এল। পাশে ঙাখ্যু, সেরসোক, মোনৎসে, বারসা, টোকচেন, ল্যোলুং, শামৎসাং, ট্রুকসুম এবং গ্যাবনাক হয়ে যাবার অনুমতি মিলল। দুটো চমরী গাই সঙ্গে নেবার ব্যবস্থাও করলেন। এমনি কি পথে ন্যায্য দরে খাবারদাবার দেবার ও রান্নাবান্নার সাজরসঞ্জাম দেবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। এতগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে আমরা মনে মনে দারুণ খুশী। যাবার আগে এক বিদায়-ভোজে তিনি আমাদের আপ্যায়িত করলেন।

"বিদায় নেবার আগে তিনি আমাদের বলে দিলেন, আমরা যেন লাসায় না যাই। মুখে রাজী হয়ে গেলুম। কিন্তু আমরা তে জানি, লাসায় যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন পথ খোলা নেই।

"অবশেষে ১৩ই জুলাই আমরা গারতোক ছাড়লুম। আমাদের ছোট্ট ক্যারাভানে তখন আমরা তিনজন লোক, আমাদের সেই গাধাটি, দুটো চমরী গাই, আর তাদের চালক। নোরবু নামে একজন গাইডও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। টাট্টুঘোড়ায় চড়ে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

"এক হপ্তা কেটে গেল। আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি পথে যাযাবরদের আস্তানা ছাড়া লোকবসতি একদম নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে বাড়ি ছিল দু-একটা, তার নাম 'তাসাম' এখানে রাত্রে শোয়া যায় আর চমরী গাই বদলে নেওয়া যায় এইরূপ একটা 'তাসামে' আমি আমার এতদিনের সঙ্গী গাধাটাকে বদলে এক গাঁট্টাগোঁট্টা চমরী গাই নিলুম। কিন্তু জন্তুটি এমন বেয়াড়া যে, কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলুম না। পরের

তাসামে' গিয়ে ওকে বদলে আবার একটা ছোটখাট চমরী গাই নিলুম। সে বেটারও মতিগতি খারাপ। শেষমেষ তার নাক ফুটো করে কাঠের মাকড়ি পরিয়ে বাগে আনলুম।

"দিনের পর দিন যে পথ দিয়ে আমরা চলেছি তার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। এপাশে ওপাশে উঁচুনীচু পাহাড়। যেন সমুদ্রের ঢেউ। তার মধ্যে চুলের সিঁথির মত সরু গিরিপথ। এতদিন শীতের খপ্পরে পড়ে ভুগছিলুম, এখন শীত কমে বেশ গরমই লাগল। সূর্যের আলো তেরচা হয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। ঝিকমিক করছে দূরের বরফ-ঢাকা পাহাড়, ছোটখাট নদী, নাম-না-জানা গাছ। আমাদের তখন লম্বা লম্বা দাড়ি গজিয়ে গেছে। সূর্যের প্রখর আলো আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিতে হাজার চেষ্টা করলেও শ্মশ্রুবর্ম ভেদ করতে পারল না।

"এইখানেই আছে হিমালয়ের এক গিরিশৃঙ্গ—গুরলামান্ধাতা তার নাম। পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু। আর রয়েছে বহু উপকথার স্মৃতিবিজড়িত হিন্দুদের পুণ্যভূমি কৈলাস পর্বত। আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে কৈলাস শৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমাদের সঙ্গীরা কৈলাস পর্বতকে নতি জানিয়ে প্রার্থনা শুরু করে দিল। হিন্দু আর বৌদ্ধদের ধারণা এইখানেই দেবদেবীর বাস। কৈলাস পর্বতের দর্শনলাভ হাজার পুণ্যের ফল। আমরা হিন্দু বা বৌদ্ধ নই, পুণ্যকামীও নই, কিন্তু কৈলাস পর্বতের অপার মহিমার দিকে মাথা আপনাআপনি নিচু হয়ে গেল।

"তারপরেই আর একটা বিস্ময়। মানসসরোবর। আর একটি তীর্থস্থান। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থল। বহু পৌরাণিক কাহিনী, কবিমানসেরও উৎসস্থল। রোদের ঝিলিকে ঝিকমিক মানসসরোবরের স্বচ্ছ কাকচক্ষু জল। সেই জলের আয়নায় পরিষ্কার ফুটে রয়েছে গুরলামান্ধাতার মহিমময় প্রতিবিম্ব। আমাদের পা সরছিল না। ভাবছিলুম, সব ভুলে সব ছেড়েছুড়ে এইখানেই পড়ে থাকি।"

এই সময় আমি গুনগুন করে উঠলুম—'শুনি ক্ষণে ক্ষণে, মনে মনে অতল জলের আহ্বান।'

"কি বললেন ?"—হারের জানতে চান।

"বাংলা কবিতা,—বোঝানোর অনেক হাঙ্গামা। আপনি গল্প বলে যান।"

হারের খেই ধরলেন—"আমি জলে নেমে সাঁতার কাটতে লেগে গেলুম। ঐ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গের মধ্যে আমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল।

"তীর্থযাত্রীরা এই সময় আসে না। তাই ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ নজরে পড়ল না। কয়েক মাইল দূর দূর জিনিসপত্র লেনদেনের আড্ডা আছে। দুর্বৃত্তশ্রেণীর সন্দেহজনক লোকের আনাগোনাও আছে এই সব জায়গায়। প্রায় খুনখারাপি লুটপাট হয়ে যায়।

"আমরা তখনও মানসসরোবরের কোল ঘেঁষে পুব বরাবর হাঁটছি। মনে হচ্ছিল যেন কোন 'সী-বীচ' দিয়ে চলেছি। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া, পাখির ঘোরাফেরা, জলের ঝিলিমিলি। এত কষ্টের মধ্যেও মনে হল জীবন সার্থক। মানসসরোবর দেখতে পেয়েছি।

"প্রায় তিন মাস হল আমরা চলেছি। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার কিছু মনে আছে, কিছু মনে নেই। বিপদের পর বিপদ এসেছে। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। সংকল্পের দৃঢ়তায় আমরা বিপদকে বিপদ বলে মনে করিনি। কষ্ট সহ্য করেছি হাসিমুখে। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে হয়ে আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় গন্ধ বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রইল না। আমরাও যাযাবর শ্রেণীর লোক হয়ে গেছি। নোংরা পোশাক, মুখে একগাল দাড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। খাওয়াদাওয়া যাযাবরদের মতন, পোশাক-পরিচ্ছদও তাই। শুয়েছি খোলা আকাশের তলায়। দিনের বেলা হেঁটেছি। রাত্তিরে তাঁবু খাটিয়ে আগুনে ধুনী জ্বালিয়েছি। শুকনো মাংস আগুনে ঝলসিয়ে গবগব করে খেয়েছি। সামান্য

বিশ্রাম নিয়ে আবার পদযাত্রা। পেরিয়ে গেছি মাইলের পর মাইল। দিন মাস কোন্ দিকে চলে যাচ্ছে টের পাইনি।

"একই পথের পথিক, একই দুঃখকষ্টের শরিক আমরা তিন বন্ধু। যত দিন যায়, ততই বন্ধুত্বের নিগড়ে একজন আর একজনের হৃদয়ের নিকটে আসি, কখনও একজন আর একজনের উপর রাগ করি, একই মুখ দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হই, কিন্তু সে সাময়িক। একজনের মনে হতাশা এলে অন্যজন সান্ত্বনা দিই। মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ হলে একজন আর একজনের কাঁধে ভর করি। তবু আমাদের পথ চলা থামেনি। আমরা তখন সভ্যতার জগৎ থেকে দূরে, বহু দূরে এক অপরিচিত রহস্যের দেশের গহ্বরে। সভ্যতার আলোক কবে দেখব তারও স্থিরতা নেই। আমরা শুধু এগিয়ে চলেছি সামনে চলার নেশায়।

"কিছু দূর যেতেই সাংপো নদী অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। পুরো পনের দিন সাংপো নদী বরাবর এগিয়ে চললুম। যত এগোই, ততই দেখি নদীর গায়ে গত্তি লাগছে। ছোটখাট নদীনালা, সাংপোর সঙ্গে মিশে সাংপোকে আরও খরস্রোতা আরও চওড়া করে তুলেছে। আমাদের বেশ মজা লাগছিল!

"আবহাওয়ারও তখন ঠিক ছিল না। এই শীত, এই গরম। ক্ষণে ক্ষণে পালটাছে। আজ যদি রোদে সব পুড়ে যায়, কাল দেখি বৃষ্টি আর তুষারপাতের বিরাম নেই। ঋতুবদলের ত্বরিৎগতিতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের তাঁবুটা বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কড়া রোদ্দুর তাঁবু ঝলসে সব বরফ সাবাড় করে দিয়েছে। আমাদের যা পোশাক ছিল, তাতে এই ঠাণ্ডা-গরমের বাড়াবাড়িতে অসুবিধে হচ্ছিল। তিব্বতীদের ভেড়ার চামড়ার আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক দেখে হিংসেই হচ্ছিল।

"নানা অসুবিধে সত্ত্বেও আমাদের যাত্রা মন্দীভূত হয়নি। এগিয়ে চলেছি, আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছি

হিমালয়কে। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। হিমালয়ের এক নেশা আছে।

"আমরা তখন গ্যাবনাকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এতদূর পর্যন্ত যাবার পারমিট আছে আমাদের। আবার আমাদের চিন্তা, এখন কি করব?

"প্রথমে গ্যাবনাক গ্রাম। সেখান থেকে ট্রাঙ্কুন ট্রাপুনেং। পথে আমার জীবনের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল। চলছি চলছি, হঠাৎ দেখি দূরে সোনার পাতে মোড়া এক বৌদ্ধমঠ, প্রভাতীসূর্য আলোর তীর দিয়ে গেঁথে গেঁথে রেখেছে মঠের চূড়ো। মঠের সোনারঙে আর রোদের সোনারঙে মাখামাখি। আর ঠিক তারই উপর অতিকায় ত্রিমূর্তি। পাশাপাশি। সেই সূর্যেরই আলো শ্বেতশুভ্র তুষারদৈত্যের গায়ে ঠিকরে পড়ে সমস্ত পৃথিবী যেন স্তম্ভিত করে রেখেছে। পরে জানতে পারলুম এই তিনটে তুষার-দৈত্যের নাম ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা আর মানাসলু। এমন দৃশ্য দেখে নয়ন সার্থক। জীবন সার্থক।"

হারের সাহেব একটু থামলেন। বললেন, "দাঁড়ান, একটু কথা বলে আসি চার্চিলের সঙ্গে।" আমাদের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হারের আরও কয়েকবার চার্চিলের ডাকে রিপোর্টের শ্লিপ নিয়ে এসেছেন। ওদের লেখাও প্রায় হয়ে গেল। আর সাত আট শ্লিপ বাকী। পরে গল্প বলার ফাঁকে বাকী শ্লিপগুলোও যথাস্থানে পৌঁছে যায়। এক একটা শ্লিপে গল্পের সম্।

শিলিগুড়ি শহরে তখন রাত আরও নেমেছে। লোকজনের ঘোরাফেরা কম। শুধু টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে অন্য কাগজের দু-একজন সাংবাদিকের আনাগোনা। রাস্তার ওপাশে চায়ের দোকানের কলরব বাড়ছে বই কমছে না। ইতিমধ্যে আমি আরও দু কাপ চা এনে রেখে দিলুম। হারের সাহেব এলেন। চা দেখে খুশীই হলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে আবার গল্প শুরু।

"হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বিকেলের দিকে যখন ট্রাঙ্কুন পৌঁছলুম,

মনে হল এক রূপকথার রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট ছোট মাটির বাড়ি। সব বাড়ি ছাপিয়ে সেই বৌদ্ধমঠের স্বর্ণাভা। পিছনে হিমালয়।

"আমরা পৌঁছতেই আমাদের জন্যে নিদিষ্ট এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ঐ বাড়িতে একটু পা ছড়িয়ে বসতে না বসতেই কয়েকজন লোক এসে হাজির। সবিনয়ে জানাল, 'তাঁদের প্রভুর কাছে যেতে হবে।' আমরা তার পিছু নিলুম।

"একটা বড় বাড়ির হল ঘরে ঢুকেই দেখি নাতুসনুতুস হাসিখুশী এক বৌদ্ধভিক্ষু বসে আছেন। ইনিই এখানকার কর্মকর্তা। আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক। নিচু একটা আসনে গ্যাবনাকের একজন কর্মচারী আর নেপালের একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন; পরে ইনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করতে লাগলেন।

"একটা খালি বেঞ্চি ছিল। আমরা সেখানে বসলুম। চা আর খাবার দেওয়া হল। খেলুম। তারপর পারমিট দেখতে চাইলেন; দেখালুম। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমরা সত্যিই কি জর্মন? আমরা সত্যিই কি পলাতক যুদ্ধবন্দী? ইংরেজ বা রাশিয়ানও তো হতে পারি।

"মালপত্র খোলা হল। তারপর চলল খানাতল্লাশী। কে জানে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না! কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু একখানা তিব্বতী ব্যাকরণ আর ইতিহাসের বই।

"বৌদ্ধভিক্ষু বললেন—পারমিটে লেখা আছে, আমরা নেপাল যেতে চাই। এতে তাঁর আপত্তি নেই। কাল ভোরেই আমরা রওনা দিতে পারি। 'কোরেলা' গিরিপথ পেরিয়ে দুদিনেই নেপাল সীমান্তে পৌঁছব।

"আমাদের কিন্তু এই ব্যবস্থা পছন্দ হল না। আমাদের যেমন করেই হোক তিব্বতে থাকতে হবে। আমরা জোরের সঙ্গে বলতে লাগলুম, তিব্বত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে থাকতে বাধা কি?

"ভিক্ষুও নাছোড়বান্দা। জানালেন পারমিটে যা লেখা আছে তার নড়চড় হবে না। যাই হোক, বিদায় নেবার আগে আমরা জানালুম ট্রাহুনে আরও কয়েকদিন থাকব।

"পরদিন আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়ানো হল। চমৎকার চীনে খাবার। এতদিনের যাচ্ছেতাই খাওয়ার পর খাসা চীনে রান্না পেয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলুম। খাওয়ার পর দিশী বীয়র এল। স্বাদ অন্য রকম হলেও আমরা ঢকঢক করে পান করলুম। ভিক্ষু বীয়র স্পর্শ করলেন না।

"তারপর নানা কথাবার্তা চলতে চলতে আমাদের প্রসঙ্গ এল। বলা হল, ভিক্ষু লাসার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের তিব্বতে থাকার অনুমতি নেওয়া সম্পর্কে চিঠি দিচ্ছেন। তিনি আমাদের ইংরেজীতে দুখানা আবেদনপত্র লেখার অনুরোধও করলেন। আবেদন লাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমরা তক্ষুনি আবেদন লিখে ফেললুম। ভিক্ষু নিজের সুপারিশ জুড়ে দিলেন। এবং খানিকক্ষণের মধ্যে একজন লোক চিঠি নিয়ে লাসা রওনা হল। ভিক্ষুর অপ্রত্যাশিত দয়ায় আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানালুম। কৃতজ্ঞতা জানালুম। ঠিক করলুম, লাসার উত্তর না আসা পর্যন্ত ট্রাহুনেই থাকব।

"বাড়িতে ফিরে দেখি, আমাদের জন্যে একগাদা খাবারদাবার কে যেন পাঠিয়ে দিয়েছে। ময়দা, চাল, ভেড়ার মাংস। এ নিশ্চয়ই ঐ সদাশয় ভিক্ষুর কাণ্ড। প্রায় এক মাসের খাবার।

"এখন কোন ভাবনাচিন্তা নেই, খাওদাও, ঘুরে বেড়াও, কাজকর্মের বালাই নেই। হাঁটার কষ্ট নেই, বিপদের ঝুঁকি নেই। মনে হল আমরা যেন কোন স্যানাটোরিয়ামে আছি। এদিকে আমাদের আবেদনও লাসার পথে। অনুমতি এসে গেলেই আমাদের আর পায় কে ? কোপ আনন্দে গান জুড়ে দিল।

"দিন যায়। এদিকে-ওদিকে ঘুরেফিরে আমাদের দিন কাটে। ট্রাহুনের লোকজনের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। ওদের পালপার্বণে

আমরাও যোগ দিই। ভাঙাভাঙা তিব্বতী ভাষার মারফত কথাবর্তা বেশ চালাই। দিন দিন নতুন ভাষা আমাদের রপ্ত হয়ে আসছে। এক একবার মনে হয়, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা বা মানাসলুর চূড়োয় উঠতে চেষ্টা করি। কিংবা কাছের কোন ছোট পাহাড়ের তলায় যাই। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। ট্রাডুনের এক মাইল এলাকা আমাদের চলাফেরার গণ্ডী। তার বাইরে যাবার হুকুম নেই। দিন যায়। লাসা থেকে চিঠির উত্তর আর আসে না। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলুম। আর ভাল লাগছে না। এতদিন হাঁটতে হাঁটতে চলাটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। পথ চলাতেই আনন্দ। এখানে কুড়েমির জীবন কাটাতে কাটাতে এক জায়গায় বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হয়েছে কোপ। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। এই অলস জীবনে আমাদের মধ্যেও খিটিমিটি বেড়ে গেল। কথায় কথায় রাগ, ঝগড়া। কোপ তো একদিন ঝগড়া করে আমাদের দুজনের সঙ্গে কথাবার্তাই বন্ধ করে দিল। বেচারা কোপ!

"তিন মাস কেটে গেছে। এমন সময় নেপাল থেকে এক হোমরাচোমরা লোক ট্রাডুনে এলেন। আমাদের সঙ্গেও দেখা করলেন। বললেন, আমরা যদি নেপাল গেতে রাজী হই, তিনি কাঠমাণ্ডুতে ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন, কোন অসুবিধে হবে না। লোভনীয় আহ্বান। কিন্তু রাজী হলুম না।

"এদিকে কোপ বেঁকে বসল। সে বলল, নেপাল যাবার নিমন্ত্রণ সে রাখবে। আমরা তাকে অনেক বোঝালুম। কোন লাভ হল না। কোপ বলল, অনিশ্চিতের জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। তার বিশ্বাস, লাসার উত্তর আর আসবে না।

"আউফশ্নাইটের আর আমি নেপাল যেতে চাইলুম না। আউফশ্নাইটের বলল, সে আর লাসার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করবে না। চাং থাং হয়ে লাসার দিকে পাড়ি দেবে। জবাব

আসার স্থিরতা না থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু তার প্রতীক্ষায়ই আছি।

"অধৈর্য আউফশ্নাইটের একদিন বিকেলে মালপত্র ঘাড়ে চাপিয়ে রওনা দিল। বিদায় নেবার আগে বললুম—'শীগগিরই দেখা হবে। আমিও পিছন পিছন আসছি।'

"এদিকে কোপ নেপাল যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোপের নেপাল যাত্রায় খুশীই হলেন। কিন্তু আউফশ্নাইটেরের উপর রেগে গেলেন। তখন থেকে আমাদের কড়া পাহারা দেওয়া শুরু হল।

"তার পরের দিন কোপের নেপাল রওনা হবার কথা। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে শেষ রাত কাটাচ্ছি। সুখেদুঃখে বিপদেআপদে আমাদের এতদিন কেটেছে, কাল থেকে আমরা ভিন্ন পথের পথিক। দুজনের মন বড় খারাপ।

"এমন সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

"'কে ?'

"বেরিয়ে দেখি আউফশ্নাইটের। কি ব্যাপার ? সে জানাল, মাইল কয়েক যেতে না যেতেই একপাল নেকড়ে বাঘ তাকে এমন তাড়া করে যে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

"আউফশ্নাইটেরকে পেয়ে আমাদের বড় ভাল লাগল। তিন বন্ধুতে একসঙ্গে শেষ রাত কাটালুম। বড় সুখের রাত, বড় দুঃখের রাত। কাল ভোরেই কোপ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

"পরদিন কোপ চলে গেল। নেপাল। পড়ে রইলুম আমি আর আউফশ্নাইটের। পুরাতন দুই বন্ধু। নাঙ্গা পর্বত অভিযাত্রী দলে আমরা দুজনেই এসেছি, মাঝে কয়েকবার ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আবার মিলেছি। গোড়ায় পাঁচজন এসেছিলুম তিব্বত। প্রথমে দুজন চলে গেল। তারপর কোপ। বাকী রইলুম আমরা দুজন। আমি আর আউফশ্নাইটের। আমাদের সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

"শীত এসে গেছে। নবেম্বরের শেষ। দারুণ ঠাণ্ডা। হাত পা জমে যাবার যোগাড়। আমাদের জন্যে পাঠানো হল চমরী গাইয়ের ঘুঁটে—আগুন পোহাবার জন্যে। সারাদিন আগুনের প্রয়োজনও ছিল। তাপমাত্রা তখন মাইনাস বারো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

"এত শীত সত্ত্বেও আমরা ঠিক করলুম ট্রাহুন ছাড়তে হবে। লাসার জবাব আসুক আর না আসুক, অনুমতি মিলুক আর নাই মিলুক। খাবারদাবার ও শীতের কাপড় কিনলুম। কিনলুম আর একটি চমরী গাই। তৈরী হলুম এগিয়ে যাবার জন্যে।

"আমাদের রওনা হবার মুখে হঠাৎ একদিন বহুপ্রতীক্ষিত লাসার সেই জবাব এসে পৌঁছল। যা ভয় করেছিলুম তাই। তিব্বতের ভিতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

"ভিক্ষু জানালেন, ক্যিরোং দিয়ে নেপাল যেতে। সেখান থেকে মাত্র আট মাইল নেপাল সীমান্ত। তারপরেই সাতাদনের হাঁটাপথ কাঠমাণ্ডু। গাইড ইত্যাদি সব সঙ্গে দেওয়া হবে। আমরা রাজী হলুম। আমাদের মতলব, খানিকটা এগিয়েই গাইডের চোখে ধুলো দেব। নেপাল যাব না ছাই।

"ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ট্রাহুন ছাড়লুম। চার মাস একনাগাড়ে একই জায়গায় থাকার পর আমরা নতুন পথে পাড়ি দিলুম। ভালই লাগছিল।

"আবার পদযাত্রা। আমি আর আউফশ্নাইটের। সঙ্গে দুজন চাকর। একজনের হাতে ক্যিরোংয়ের জেলা-কর্মচারীকে লেখা একখানা চিঠি। আমরা সবাই টাট্টুঘোড়ায় চড়ে চলেছি। দুটো চমরী গাইয়ের পিঠে মাল চাপানো। চমরী গাই আর মালের ভার আর একজন লোকের উপর।

"সারা শরীর গরম কাপড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবু দুরন্ত শীতকে আটকানো যাচ্ছে না। ছুঁচের মতন গায়ে বিঁধছে। মনে হচ্ছে কানে হাত দিলেই কান মুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। চারদিকে

বরফ আর বরফ। সাংলা নদীও জমে বরফ হয়ে গেছে। আমরা হেঁটে পার হয়ে গেলুম।

"এক হপ্তা পর পৌঁছলুম জোংগকা। বেশ বড় গ্রাম। শ'খানেক বাড়ি আছে। ফসলের মাঠ আছে। মঠ আছে। গ্রামের গায়ে লাগা হিমালয়ের বিশ হাজার ফুট উঁচু এক গিরিশৃঙ্গ। নাম চোগুলহারি।

"জোংগকায় যেদিন পৌঁছলুম, সেদিন বড়দিন। পলাতক জীবনের প্রথম বড়দিন। আমাদের এক ভাল বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হল। আমরা বাতি জ্বালিয়ে গান গেয়ে বড়দিন পালন করলুম। জীবনে অনেক বড়দিন পালন করেছি। এই ধরনের উৎসব পালনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। বলতে দ্বিধা নেই, ঠিক ঐ সময় আমি কিছুটা 'হোম-সিক' হয়ে পড়ি। বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছিল। আমার কোন খবর আমার আত্মীয়স্বজনেরা জানে না। মরে আছি না বেঁচে আছি। আজ বড়দিনে সবাই ওরা আনন্দে মেতে আছে। আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়ই স্মরণ করছে আমার কথা। জোংগকার এই বাড়িতে বসে নিজেকে এই মুহূর্তে বড় অসহায়, বড় একা মনে হতে লাগল।

"জোংগকাতে বেশীদিন থাকার প্ল্যান আমাদের ছিল না। কিন্তু থাকতেই হল। চারদিকে দারুণ তুষারপাত। বাইরে বেরোনোর সাধ্যি নেই। গোটা মাসই আমাদের তাই থাকতে হল জোংগকায়। বরফের চাপে রাস্তাঘাট সব বন্ধ। আমরা কম্বল-মুড়ি দিয়ে আগুনে ধুনি জ্বালিয়ে দিনের পর দিন বসে রইলুম।

"জানুয়ারী মাসের উনিশ কুড়ি তারিখ। রাস্তাঘাট। বরফের ছদ্মবেশ খসিয়ে লোক-চলাচলের কিছুটা উপযোগী হল। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। তাপমাত্রা কিন্তু তখন মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সুতরাং বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। শীতের দাপটটা আপনিই আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

"পথে লোংদা গ্রামের পাশে এক পাহাড়-কাটা মঠ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রায় সাতাশ ফুট উঁচু লাল পাথরের মন্দির, আর মন্দিরে অসংখ্য খোপ। পাখির বাসার মত। মঠে ঢুকে কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গে আলাপ করলুম। ওঁরা বললেন, তিব্বতের বিখ্যাত সন্তকবি। 'মিলারে-পা' এই মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। সত্যি, জায়গাটা কবি আর সাধুপুরুষের সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে।

"ক্যিরোং নামের অর্থ কি জানেন? 'সুখের গাঁ'। নামটা সার্থক।" হারের বলেন—"আমায় যদি জিজ্ঞেস করেন, সারা-জীবন কোথায় কাটাতে চান? আমি বলব ক্যিরোং।"

"অর্থাৎ মিঃ হারের, আপনি বলতে চান, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"—আমি ফোড়ন কাটি।

"ঠিক তাই। সম্ভব হলে ঐখানেই আমি বাড়ি বানাতুম। আবহাওয়া আমার দেশের মতই অনেকটা। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? তা অস্ট্রিয়া সুইজারল্যাণ্ডকেও টেক্কা মারে। চারদিকে নয়ন-মনের অজস্র খোরাক। যত ইচ্ছে চেখে নাও। তিব্বতের ভিতর এমন সুন্দর জায়গা থাকতে পারে, কল্পনাও করতে পারি-নি। পৃথিবীর অনেক জায়গা দেখেছি, কিন্তু ক্যিরোং অতুলনীয়।

"বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দুজন জেলা-গবর্নর থাকেন এখানে। শাসন করেন তিরিশটি গ্রাম। আমরাই বোধ হয় প্রথম ইউরোপীয় ক্যিরোংয়ে পা দিলুম। যে বাড়িতে আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল, তা যেন আমার দেশের গ্রামের কোন বাড়ি। দারুণ মিল। এখানে শুধু প্রার্থনা-পতাকার ছড়াছড়ি। এই যা তফাত। আবহাওয়া চমৎকার।

"জেলা-গবর্নরের সঙ্গে এসেই দেখা করলুম। তাঁর ধারণা, আমরা নেপালেই যাচ্ছি। নেপালের একজন লোক তখন ক্যিরোং ছিলেন। তিনি কাঠমাণ্ডু নিয়ে যাবার জন্যে প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। মোটরগাড়ি, সিনেমা কিছুই তখন আমাদের

প্রলুব্ধ করতে পারল না। ইতিমধ্যে শুনলুম, কোপ কাঠমাণ্ডুতে কিছুদিন থেকে ভারতে চলে গেছে। আবার সেই কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে।

"শুনে নেপাল যাবার ইচ্ছে একরত্তিও রইল না। আবার সেই কাঁটাতারের বেড়া? বাপ রে!

"আমরা ক্যিরোং থেকে গেলুম। মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো লাসা থেকে পাওয়া যাবে তিব্বতে থাকার 'রেসিডেন্ট-পারমিট।' একদিকে সেই চেষ্টা চালালুম, অন্যদিকে ক্যিরোং থেকে পালাবার ফন্দিফিকিরও আঁটতে লাগলুম।

"ক্যিরোংয়ে আমাদের ন'মাস থাকতে হয়েছে। তবু বিরক্তি ধরেনি। এমন চমৎকার জায়গায় কার বা বিরক্তি ধরে। আউফশ্লাইটের আর আমি তিব্বতীদের আচার-ব্যবহার নজর করে করে নোটবুকে টুকে রাখতে লাগলুম। পরে প্রয়োজন হবে।

"তাছাড়া আশেপাশে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কোন বাধানিষেধ ছিল না। মুক্ত বিহঙ্গের মত আমরা পাহাড় বেয়ে উঠি, উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়াই।

"ক্যিরোংয়ে এক ভিক্ষু-চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি লাসায় অনেক দিন চিকিৎসা-বিদ্যা চর্চা করেছিলেন। আমারও চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে ঝোঁক ছিল। কিন্তু এই তিব্বতী চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করে আঁতকে উঠলুম। সাংঘাতিক ধরনের চিকিৎসা-ব্যবস্থা। একটা উদাহরণ দিই। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার চেতনা আনতে হলে উনি কি করেন জানেন? এক লোহার ডাণ্ডা আগুনে তাতিয়ে রোগীর গায়ে লাগিয়ে দেন। সাময়িকভাবে রোগীর চেতনা ফিরে আসে ঠিকই; কিন্তু উনি নিজেই স্বীকার করলেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফল ভাল হয় না। তিনি নাকি বেশীদিন এক জায়গায় থাকেন না। কেন থাকেন না বুঝেছি। রোগীদের আত্মীয়স্বজন মারমুখো হয়ে গেলেই বোধ হয় পালান।

"ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এই প্রথম তিব্বতী নববর্ষ উৎসব দেখার সুযোগ হল। সারা ক্যিরোং জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তিব্বতীদের কাছে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আগের রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে মন্ত্রোচ্চারণ আর গান। তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝলুম না। কিন্তু সমস্ত পাহাড়, বন, বাড়িঘর গমগম করতে লাগল। পরদিন ভিক্ষুরা বেরোলেন ভিক্ষায় ভিক্ষাপাত্র হাতে। বাড়ির ছাদে ছাদে উড়তে লাগল নতুন নতুন প্রার্থনা-পতাকা। ভগবান বুদ্ধের কাছে নিবেদন করা হল প্রিয় খাবার মাখন, 'ৎসাম্পা'। মঠে মঠে মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনি। রেশমী চাদর মেলে দিয়ে সবাই নত হয়ে পড়ল বুদ্ধমূর্তির পায়ে। প্রার্থনা করল, সুখ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য। 'হে ভগবান, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর।'

"ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবাই চলেছে মঠ-মন্দিরের দিকে। আশীর্বাদ কামনায়। তারপর পুরো সাতদিন ধরে আনন্দোৎসব। নাচে-গানে হৈ-হল্লায় সবাই মাতাল। বাহারী পোশাকের ছড়াছড়ি। আমরাও যোগ দিলুম।

"সুখের পরেই দুঃখ। আনন্দের পর বিষাদ। এতদিনের এক-টানা আনন্দোৎসবের পর ক্যিরোংয়ে ঘটে গেল কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা। আমরা যাদের বাড়িতে ছিলুম, সে বাড়ির মেয়েটির অসুখ হল। আমি দেখেই টের পেলুম, বসন্ত। মেয়েটি মারা গেল। আরও কয়েকজনও। আমরা ভয় পেয়ে গেলুম।

"বরাত ভাল, বসন্ত মহামারীর রূপ নেয়নি। নিল অন্য একটি রোগ। আমাশয়। জোংগকায় আমাশয় মহামারীর হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সেখানকার জেলা-অফিসার সপরিবারে ক্যিরোং পালিয়ে এলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এল সেই মহামারীর বীজ। একে একে তিনটি সন্তান মারা গেল। আমাদের কাছে আমাশয়ের ওষুধ ছিল। কাজ হল না। চতুর্থ সন্তানটিকে রোগাক্রান্ত হবার পর আমরা বললুম, কাঠমাণ্ডুতে লোক পাঠাতে। ওঁরা রাজী হলেন না। সেই ভিক্ষুচিকিৎসকের

হাতে সঁপে দিলেন সন্তানকে। যা হবার তাই হল। চতুর্থটিও মারা গেল। তারপর বাড়িতে বাড়িতে আমাশয়। ক্যিরোংয়ে নেমে এল বিষাদের ছায়া।

"কিছুদিন পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আবার জানালেন, আমাদের ক্যিরোং ছাড়তে হবে। ইতিমধ্যে আমরা ব্যবসায়ীদের মারফত খবর পেলুন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানতুম যে, প্রথম মহাযুদ্ধের দু বছর পরও ইংরেজরা যুদ্ধ-বন্দীশিবির রেখে দেয়। তাই আমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। তিব্বতের ভিতরে ঢুকবার চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। তাছাড়া এই রহস্যময় দেশকে জানার আগ্রহও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভাষা রপ্ত করেছি, অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর।

"কর্তৃপক্ষকে জানালুম, শরৎকালে ক্যিরোং ছাড়ব। তবে এখানে আমাদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার হুকুম দিতে হবে। তাই হল। আমরা পিকনিক, এক্সকার্সন ইত্যাদির নাম করে জোংগকা না ছুঁয়ে তিব্বতের আরও ভিতরে যাবার রাস্তা খুঁজতে লেগে গেলুম।

"প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আমি এদিকে এক মারাত্মক ভুল করে বসলুম। আমার মূলধন বাড়াবার জন্যে ক্যিরোংয়ের একজনকে শতকরা তেত্রিশ টাকা সুদে আমার গচ্ছিত টাকা ধার দিয়ে দিই। যাবার আয়োজন চলছে, অথচ লোকটা টাকা ফেরত দিচ্ছে না। হাতে আর টাকাও নেই। মহা মুশকিল!

"শরৎ এসে গেছে। এবার ক্যিরোং ছাড়ার পালা। তবে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী নেপালের দিকে নয়। কিছুতেই নয়।

"দীর্ঘ-যাত্রার খাবারদাবার যোগাড় করলুম। লুকিয়ে রাখলুম দূরে এক জায়গায়। রওনা হব-হব ভাবছি, এমন সময় বাধল আর একটা মুশকিল। শরৎকালেই বরফ পড়তে শুরু করে দিল। পথঘাট বন্ধ হবার উপক্রম। ঠিক করলুম, সব কিছু তাড়াতাড়ি করতে হবে। এদিকে স্থানীয় লোকেরাও আমাদের গতিবিধি

কিছুটা আঁচ করে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শোনে, পিছন পিছন ঘোরে।

"ঠিক হল, এদের নজর এড়িয়ে এক্সকার্সনের নাম করে আউফশ্লাইটের আগে চলে যাবে। ১৯০৫ সালের ৬ই নবেম্বর সে দিনের বেলা গ্রাম ছাড়ল, পিঠে মালের বোঝা চাপিয়ে। তার সঙ্গে গেল আমার তিব্বতী কুকুরটা।

"এদিকে আমি আমার ধার-দেওয়া টাকা ফেরত পাবার জোর চেষ্টা করছি। কিন্তু লোকটা মহা ত্যাঁদড়। কিছুতেই টাকা দিতে চায় না। বলে, আউফশ্লাইটের ফিরে এলে দেবে। আউফশ্লাইটেরের খোঁজে লোক ছুটল। আমাকেও প্রায় নজরবন্দী করে রাখা হল। আমি যতই বলি আউফশ্লাইটের অন্যান্য দিনের মত এক্সকার্সনে গেছে, ওরা ততই সন্দেহ করে। আমি টাকার তাগাদা করতে লাগলুম। চাপে পড়ে মোট টাকার কিছুটা দিল। আর বলল, বাকীটা আউফশ্লাইটের ফিরলেই দেবে। উফ্, লোকটাকে টাকা ধার দিয়ে কি ভুলই না করেছি।

"নবেম্বরের আট তারিখ ঠিক করলুম, আজই আমাকে যেতে হবে। যেমন করেই হোক! রাত দশটা বাজল। পালাব পালাব ভাবছি। কিন্তু লোকজন আমার ঘরের চারপাশ থেকে যায় না। যাবার কোন লক্ষণও নেই। আমি ভীষণ রেগে গেছি, এই ভান করে বেরিয়ে এসে বললুম, তোমাদের ব্যবহারে আমি ভীষণ দুঃখিত। এরকম করলে আমি জঙ্গলে গিয়ে রাত কাটাব। এবং সত্যি সত্যি মালপত্র কাঁধে চাপিয়ে রওনা হয়ে গেলুম। আমার লাগোয়া বাড়ির বুড়ী ছুটে এল। কেঁদে মাটি ভাসিয়ে জোড়হাত করে বলল, আমি যেন এভাবে না যাই। এভাবে গেলে ওদের চাবুক মেরে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

"আমি তখন অচল, অনড়। যাবই। আমি যাবই। এবং সত্যি সত্যি রেগেমেগে হনহন করে বেরিয়ে গেলুম।

"এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক লোক

এসে হাজির। বলল, এই রাত এখানে কাটালে পরদিন আমাকে যেখানে খুশি যেতে দেওয়া হবে। আমি 'স্পীকটি নট'। ওদের মতলব বুঝে গেছি। সবাইকে ধমকে ছুটে চললুম। একদল লোক আমার পিছন পিছন চলল। কিন্তু আমার রক্তচক্ষু দেখে দৌড়ে পালাল। আমি এগিয়ে চললুম। সারারাত হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলুম। ভোরবেলা দেখলুম আউক্‌শ্লাইটের ঠিক জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। কুকুরটা আমাকে দেখে ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কোলে।

"রাস্তা চেনাই ছিল। এগিয়ে চললুম। ভীষণ ঠাণ্ডা। শূন্যের নীচে পনের ডিগ্রী। সারা শরীর জমে যাবার যোগাড়। তবু চলেছি। থামিনি। দীর্ঘ পথ-শ্রমের পর জোংগকায় কাটিয়ে নতুন পথে নতুন দেশে চলে এলুম। এখন নাগাল পেতে হবে ব্রহ্মপুত্রের।

"কিন্তু নদী পার হব কি করে? ভীষণ সমস্যা। পথে পড়ল ঘন নীল জলের হ্রদ 'পেলুগু।' এদিকে-ওদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। চাপ চাপ বরফ জমা। শুকনো গাছের ডালে ডালে পেঁজা তুলোর মত বরফের ফুল। চারদিকেই বরফ। আমাদের গায়ের জামা-কাপড়ে, দাড়িতেও বরফ। তবু থামার উপায় নেই, থামলেই মৃত্যু।

"কয়েকদিন অবিরাম চলার পর প্রাণহীন বরফ-স্তূপের দেশ পেরিয়ে আসার পর একদিন হঠাৎ প্রাণের লক্ষণ দেখতে পেলুম। একপাল ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম—'ভেড়া ভেড়া।' পিছনে রাখাল।

"রাখাল ছেলেটি আমাদের ভূতটুত ভেবে ভয় পেয়ে গেল। পালিয়ে যাবার উপক্রম করতেই কাছে এসে জানতে চাইলুম, কাছাকাছি গ্রাম কোথায়। সে আঙুল দিয়ে দেখাল। আমরা ঐ দিকেই চললুম। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলুম ত্রাকচেন গ্রামে।

"গ্রামের লোকেরা আমাদের ভারতীয় বলে ভুল করল এবং বিনাদ্বিধায় খাবারদাবারও বিক্রী করল। দীর্ঘ পদযাত্রার পর এক ঘরে ঢুকে ধুনী জ্বালিয়ে সারা শরীর গরম করলুম। আর কিছুদিন এমনি চললে নির্ঘাত তুষার-সমাধি হয়ে যেত।

"খাওয়াদাওয়া সেরে প্রচুর বিশ্রাম নিয়ে নতুন একজোড়া ভেড়ার চামড়ার পোশাক কিনে আবার রওনা দিলুম। একটা নতুন চমরী গাইও কিনলুম। গাইটা আগেকারগুলোর মতই তেমনি বেয়াড়া। ভারী বজ্জাত।

"পথে অনেক গ্রাম পড়ল। সব জায়গাতেই নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিলুম। কোন অসুবিধা হল না। পৌঁছলুম তিংগারির সমতলভূমিতে। এখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই অবাক কাণ্ড! পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট আমাদের সামনে। এই সেই এভারেস্ট, যাকে জয় করার জন্যে কত চেষ্টাই না হয়েছে, কত প্রাণই না নষ্ট হয়েছে। মানুষের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম স্নিগ্ধোজ্জ্বল এভারেস্টকে দেখতে। নয়ন-মন সার্থক করে দেখতে।

"এভারেস্টকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল। তবু যেতে হবে। যেতে হবে উত্তরে আঠার হাজার ফুট গিরিপথ 'কোবার' দিকে। গিরিপথে ওঠার ঝামেলা অনেক। তাই লাগোয়া গ্রাম খারগুতে খানিক জিরিয়ে নিলুম। পরদিন বিকেলের দিকে গিরিপথের উপরে উঠতে পারলুম। তারপর আবার নীচে নামা। নামার সময় আমাদের চমরী গাইটা বড় বেয়াড়াপনা শুরু করে দিল। কিছুতেই এগোবে না। বাগে আনতে মহা ভোগান্তি। শেষমেষ পরবর্তী আস্তানায় গিয়ে বেটাকে বদলে আর একটা চমরী গাই নিলুম।

"কয়েক ঘন্টা যাত্রার পর দেখি সবুজ জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সঙ্গে বরফের টুকরো। ইনিই সাংপো, ইনিই ব্রহ্মপুত্র। ভেবেছিলুম, শীতে হয়তো নদী জমে যাবে। আমরা অনায়াসে পেরিয়ে যাব।

কিন্তু আমাদের বরাতই খারাপ। সুন্দর টলটলে জল বয়ে চলেছে। স্রোতও ভীষণ। এখন পার হই কি করে?

"হাল ছাড়লুম না। তাকিয়ে দেখি অপর পারে বাড়িঘর, মঠ। তাহলে নদী পেরোবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। সত্যিই তাই। একটু এগিয়ে দড়ির পুল দেখতে পেলুম। পেরিয়ে গেলুম।

"তারপর অনেক ঘটনা, অনেক দিন। তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলে চলবে না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে গারতোক থেকে লাসা যাবার ক্যারাভান-রুট ধরে ফেললুম। মাঝে অনেক কাহিনী। সেগুলো বাদ দিই।

"জায়গাটার নাম 'সাংসাং গেভু'। সেখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের অনেক প্রশ্ন করলেন। তবে তেমন উত্যক্ত করলেন না। কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যে মিলিয়ে সব বলাতে বরং সহানুভূতিই দেখালেন।

"এদিকে হাতের টাকাও প্রায় শেষ। মাত্র আশী টাকা বাকী। খাবারদাবার কেনায়, চমরী গাই কেনায়, আর ওই লোকটাকে ধার দেওয়াতে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু রাস্তা যখন পেয়ে গেছি আমাদের যেতেই হবে লাসায়। আমরা চললুম শুষ্ক মরু চাংথাং উপত্যকার দিকে।

"ঠিক করলুম উত্তর-পশ্চিম দিয়ে লাসা যেতে হবে। এ-পথে কোন বিদেশী যায়নি। স্বেন হেডিনের এই পথে যাবার বাসনা ছিল। কিন্তু যেতে পারেনি। পথে শুধু যাযাবরের বাস। আর আছে লুটেরা ডাকাতের ছোট ছোট দল। ভয় হল। কিন্তু এতখানি যখন এগিয়েছি, এখন থামলে চলবে কেন? লাসা আমাদের কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে তাও জানি না। হয়তো বিরূপ অভ্যর্থনাই হবে। তবু আমরা অদম্য। 'কুছপরোয়া নেই' ভাব করে কপাল ঠুকে ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আমরা সাংসাং ছেড়ে এগিয়ে চললুম।

"প্রথম দিন বড় কষ্ট হল। শীতের উৎপাত। তারপর খাড়াই ওঠা, চড়াই ভাঙা। পথে পড়ল যাযাবরদের এক তাঁবু। একটা লোক বেরিয়ে এল। রাতের আশ্রয় ভিক্ষা করলুম। রাজী হয়ে গেল। ধন্যবাদ জানিয়ে ধুনী জ্বালালুম। সারা গায়ে লাগালুম আগুনের পরশমণি। পরদিন আবার পথচলা। রাত্তিরে যাযাবরদের এক পরিত্যক্ত তাঁবুতে ধুনী জ্বালিয়ে জেগে রইলুম। ভয়ে ঘুমোতে পারলুম না, যদি কেউ এসে পড়ে? যদি তাঁবুর মালিক এসে আমাদের উপর হামলা করে? আমাদের শরীরের অবস্থা ততদিনে কাহিল। তুষার-দংশনে হাত-পা, নাক-মুখ ফালা ফালা।

"বরাত ভাল, আরও কয়েকদিন চলার পর এক গিরিপথ পেরোতেই দেখি আর তুষারপাত নেই। বেঁচেছি। নইলে আমাদের দফা রফা হয়ে যেত। বরফ-কামড়ের হাত থেকে বাঁচতেই পারতুম না।

"হন্তদন্ত হয়ে যাযাবরদের এক তাঁবুতে ঢুকে পড়লুম। পুরুষ-মানুষ কেউ ছিল না। তাঁবুর মালিকানীই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। আগুন জ্বেলে দিল। আগুনের আঁচে আমাদের মরা দেহে প্রাণ এল। বাঁচলুম।

"মেয়েটি জানাল, তার দুই স্বামী বাইরে গেছে। ভেড়া চরাতে। তাদের পনের শ ভেড়া আর অনেকগুলি চমরী গাই।

"চমৎকার গড়ন মেয়েটির। ভোঁতা ভোঁতা নাক-মুখ। কিন্তু গড়ন? তারিফ করতে হয়। গয়না আর পোশাকের বাহারও কম নয়। দেখে চোখ জুড়োয়।

"মেয়েটির স্বামী দুজন এসেও আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। ভারতীয় ভেবে খুশীই হল। তারপর পেট পুরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করল। এতদিন পর আরামের মুখ দেখতে পেলুম। দীর্ঘ পথশ্রমের পর সুন্দরী রমণীর মুখ আর পেটভর্তি খাবারে আমাদের মলু-মেজাজ বিলকুল খোস। ওদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে

দিলুম। ওরাও বেশ হাসিখুশী। এই যাযাবরদের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। ইউরোপের সুন্দরীদের ভিড়ে মেয়েটির চেহারা হারিয়ে যায়নি।

"'খাম্-পা'। দুই সিলেব্‌লের এই একটি শব্দের মধ্যে বহু বিভীষিকা লুকিয়ে আছে। ইদানীং আপনারা খাম্-পাদের কথা খবরের কাগজ মারফত খুব শুনতে পাচ্ছেন, চীনাদের কি রকম জ্বালিয়ে মারছে, তারও খবর পাচ্ছেন। আমরা খাম্-পা শব্দটি শুনি লাসা যাবার পথে।

"নানা দুঃখকষ্টের পর ডিসেম্বরেব তোরোই পৌঁছেছি লা ব্রাং ত্রোভা। সেখানেই প্রথম আমরা বললুম—'লাসায় যাচ্ছি। তীর্থ করতে।' এখানেও আমাদের ভারতীয় বলে ভুল করেছিল। গ্রামের লোকেরা বলল—শিগাৎসে হয়ে যেতে। সোজা ভাল রাস্তা। আমরা রাজী হলুম না। শিগাৎসে তিব্বতের দোসরা নম্বর শহর। পাঞ্চেন লামার সদর দপ্তর। শিগাৎসে গেলে লাসা যাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

"আমার উত্তর তৈরীই ছিল। বললুম, 'তীর্থযাত্রী তো, দীর্ঘ কঠিন পথ অতিক্রম করে বেশী পুণ্য কামাতে চাই।'

"লোকটা খুশী হল। বলল—'তাহলে দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা দূর দুর্গম, বহু গিরিপথ, লোকবসতিও নেই। অন্য রাস্তাটা অনেক সোজা। তবে সেখানে খাম্-পারা আছে।'

"লোকটা ভীষণ ভয়ের সঙ্গে খাম্-পা কথাটা উচ্চারণ করল। আমরা এই প্রথম শব্দটা শুনলুম। জিজ্ঞেস করলুম—সে আবার কি?

"লোকটা বলল—সাংঘাতিক জিনিস, দুর্ধর্ষ ডাকাত, গায়ে দারুণ শক্তি রাখে, লুঠতরাজই ওদের পেশা, একবার কু-নজরে পড়লে আস্ত রাখবে না। খাম্ প্রদেশের লোক।

"আমরা ওর ভয়কে তেমন পাত্তা দিলুম না। ভারী তো খাম্-পা! এত ঘাট পেরিয়ে এলুম, আর এরা আমাদের কি করবে।

থোড়াই কেয়ার, আমরা খাম্‌-পা অধ্যুষিত সোজা রাস্তা দিয়ে যাব মনস্থ করলুম। কিন্তু তখন কি জানি আমাদের কপালে অনেক ভোগান্তি আছে।

"এগিয়ে চলেছি। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কোথাও লোকজন নেই। হঠাৎ টগবগ টগবগ করে ঘোড়ায় চড়ে এক অদ্ভুত পোশাকের বিদঘুটে লোক ডান দিক থেকে আমাদের কাছে এসে হাজির। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, চোখে আগুন, হাতে খোলা তরোয়াল। অদ্ভুত এক ভাষায় আমাদের চেঁচিয়ে কি বলল। বুঝলুম না। তবু বললুম—'আমরা তীর্থযাত্রী।'

"ভগবান জানেন সে কি বুঝল। যেমনি এসেছিল, তেমনি টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আন্দাজ করলুম—এই হচ্ছে খাম্‌-পা। হ্যাঁ, ভয় পাবার মত চেহারা বটে।

"কয়েক ঘণ্টা পর ঐ ধরনের অদ্ভুত পোশাক-পরা আরও দুজন লোক এসে হাজির। ঘোড়ায় চড়ে। আমরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। কিচ্ছু না বলে এগিয়ে চললুম। ওরা খানিকক্ষণ পিছু পিছু এল। ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

"বরাতজোর, কাছেই যাযাবরদের এক তাঁবু পেয়ে গেলুম। ঢুকে পড়লুম তাঁবুর ভিতরে। যাযাবররা দেখেছি বরাবরই সদাশয়। মনে দৃঢ় বিশ্বাস, এরাও তাই হবে। ঠিক তাই। খাতির করে রাখল। ঐ ষণ্ডামার্কা লোক দুটো তখন চলে গেছে।

"সন্ধ্যেবেলার আড্ডায় যাযাবররা আমাদের খাম্‌-পাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে লাগল। খাম্‌-পারা তিন-চারটে তাঁবু নিয়ে এক-একটি দল করে থাকে। ঐগুলোই হয় তাদের অভিযান চালানোর ঘাঁটি। তরোয়াল আর বন্দুক হাতে ওরা যেখানে-সেখানে হানা দেয়, লুটপাট করে, মানুষ খুন করে, আবার কোথায় চলে যায়। গোটা এলাকা তছনছ করে তবে তাদের ছুটি। তখন চলে যাবে অন্য এলাকায়। ঘাঁটি পাল্টে আবার লুটপাট। ওদের শায়েস্তা করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিছুই করা যায়নি। বরং

উল্টে অনেক তীর্থযাত্রী, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মুণ্ডু কেটে পালিয়েছে। কে ধরবে ওদের ?

"খাম্-পাদের আচার-ব্যবহার আমাদের কাছে তেমন উৎসাহ-ব্যঞ্জক মনে হল না। আমি আর আউফশ্লাইটের একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি।

"যাযাবরটি বলল, তাকেও খাম্-পারা আক্রমণ করেছিল, পাঁচশ ভেড়া উপঢৌকন দিয়ে তবে সে রক্ষা পায়। এখন তার উপর কোন উৎপাত নেই।

"পরদিন সকালে আমরা ভয়ে ভয়ে রওনা হলুম। জানি না, আমাদের কপালে কি লেখা আছে। কেন যে মরতে এ পথে এলুম। এখন কি ঘাটে এসে তরী ডুববে ? এই অচেনা জায়গায় বেঘোরে প্রাণ হারাব ? ফিরে অন্য রাস্তায় যাবার আর উপায়ও নেই।

"খানিক এগোতেই বন্দুক-হাতে একটা লোক। উঁচু এক টিলা থেকে আমাদের দেখছে। নির্ঘাত খাম্-পা। ভয়ে পা কাঁপছে। তবু সোজা চললুম। লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

"দূরে দেখা যাচ্ছে যাযাবরদের তাঁবু। আমরা একটিতে ঢুকে পড়লুম। ঢুকে হাত-পা গরম হয়ে গেল। ভয়ে সাধারণত হাত-পা ঠাণ্ডা হয়। এমনিতেও শীতে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডাই আছে। এক্ষেত্রে উল্টোটাই হল।

"যাদের তাঁবুতে ঢুকেছি, এরা খাম্-পা। জালে আটকা পড়লুম। মুখে ভাব দেখালুম কিছুই যেন জানি না। কিন্তু এদিকে মাথা দপদপ করছে।

"কাছাকাছি তাঁবু থেকে আরও কিছু লোক এল। আমরা তীর্থযাত্রী শোনার পর উপদেশ দিল, ওদের দলের একজন লোক গাইড হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যেতে। যে লোকটা আমাদের গাইড হয়ে এল, সে দেখতে বেঁটেখেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, কোমরে তরোয়াল। জল্লাদের উপযুক্ত চেহারা বটে !

"যাই হোক, কিছু না বলে শোবার তোড়জোড় করতে লাগলুম। কিন্তু আমাদের 'হোস্ট' কিছুতেই আমার রুথস্যাকটা কাছে রাখতে দেবে না। বোধ হয় সন্দেহ করল এর ভিতর পিস্তল-টিস্তল রাখা আছে। আমি ওদের সন্দেহ ভাঙলুম না। বরং বাড়িয়েই দিলুম নানা ইঙ্গিতে।

"লোকটা চলে গেল। আমরা সাবধানে জেগে রইলুম। হোস্ট মহোদয়ের স্ত্রী বাইরে প্রার্থনা শুরু করেছে। বোধ হয় কাল সকালে তাঁর স্বামী আমাদের হত্যা করে যে পাপ করবেন, সে পাপ-স্খালনের জন্যে আগাম ভগবানের কাছে উপাসনা সেরে রাখছে।

"ভয়ে ভয়ে রাত কাটল। সকালবেলা যাবার তোড়জোড় শুরু করলুম। ভাবছি, এই হয়তো কেউ আক্রমণ করবে। আমরা চমরী গাইয়ের পিঠে মাল চাপিয়ে রওনা দিলুম। খাম্-পা-পরিবার উপদেশ দিল দক্ষিণ পথ ধরে যেতে, সেখানে নাকি লাসাযাত্রী ক্যারাভান পাওয়া যাবে।

"না বাবা, মরলেও দক্ষিণ পথে যাচ্ছি না। মতলব টের পেয়ে গেছি।

"কয়েক শ গজ দূরে যেতেই খেয়াল হল আমার কুকুরটা আসে-নি। তাঁবুতে থেকে গেছে সন্দেহ হল। কুকুরটা বিনা ডাকেই বরাবর চলে আসে। কেন এল না? ভাবনা শেষ হবার আগেই তিনজন লোক আমাদের কাছে ছুটে এল। বলল, ওরাও এই পথে যাবে। ঐ যেখানে যাযাবরদের তাঁবুর উপরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সেই দিকে। আমাদের সন্দেহ বাড়ল। যাযাবরদের তাঁবুতে তো ঐ রকম ধোঁয়ার চিমনি থাকে না।

"আমরা কুকুরের কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন বলল—যে কোন একজন কুকুরটা নিয়ে আসতে পার। বুঝেছি। আমাদের আলাদা করে দেবার মতলব। দুজনকে একসঙ্গে আক্রমণ করার অনেক অসুবিধে। উঁহু, সেটি হবে না। আমরা হঠাৎ আক্রমণের

জন্যে তৈরী থেকে কুকুরটা আনতে একসঙ্গেই ঐ তাঁবুর দিকে চললুম।

"কুকুরটাকে ফিরিয়ে এনে আমরা অন্য পথ ধরলুম। আগেকার পথ প্রাণের দায়ে বাতিল করতে হল। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। এতক্ষণ কেন যে আমাদের খাম্-পারা আক্রমণ করেনি তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সম্ভবত ওরা ভেবেছে, আমাদের কাছে পিস্তল বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তাই সাহস পাচ্ছিল না।

"যাই হোক, নতুন পথে এগিয়ে যে যাযাবরের তাঁবুতে আশ্রয় পেলুম, সেখানে মোটামুটি স্বস্তিতেই সময় কাটল। সেখানে বসেই আমাদের নতুন প্ল্যান করতে হল। খাম্-পাদের রাজত্বের ভিতর দিয়ে আর এগোনো নয়। নেহাত বরাতজোরে এতক্ষণ আমাদের ওরা কচুকাটা করেনি। কিন্তু আর ঝুঁকি নেওয়া চলে না। সঙ্গে সত্যি সত্যি কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকলে অবিশ্যি আলাদা কথা ছিল। বেটাদের দেখিয়ে দিতুম।

"জনবসতিহীন আরও দুর্গম রাস্তাই আমাদের নিতে হবে। নান্য পন্থাঃ। প্রচুর শুকনো মাংস কিনলুম। কারণ নতুন প্ল্যান অনুসারে আমাদের দিন দশেক পথে দেরী হবে। লোকজনও পাব না। তাই পেটের রসদ চাই-ই চাই।

"দুর্গম শর্টকাট রাস্তায় এগোলুম। পিছনে তাকিয়ে দেখি, দুজন খাম্-পা সেই তাঁবুর দিকে এগিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে। সম্ভবত আমাদের বার্তাটা ঐ তাঁবুতেই জেনে নিয়েছে। নাছোড়বান্দা ঐ খাম্-পারা মহা-বদ।

"এখন কি করি? গতি বাড়িয়ে দিলুম। কিন্তু কতটুকুই বা সম্ভব। মাল পিঠে নিয়ে চমরী গাই চলছে শম্বুকগতিতে। ইশ, সঙ্গে যদি কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকত। লোক দুটোকে আর দেখতে পেলুম না। এখনও পিছু নিয়েছে কি না কে জানে। প্রায় এক ঘণ্টা দৌড়লুম। চমরী গাইকে হিঁচড়ে টেনে নিলুম। উঠলুম এক

টিলার উপরে। দেখি খাম্‌-পা দুটো এক জায়গায় বসে পড়েছে। তারপর আবার উঠল। আমরা বড় বড় পাথর জড করে আর তাঁবুর ডাণ্ডা হাতে নিয়ে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হয়ে গেলুম। যা থাকে কপালে।

"খাম্‌-পা দুটো চলে গেল। আঃ, এতক্ষণে শ্বাস পড়ল।

"ফের ভোঁ ভোঁ দৌড়। খাম-পা-ভীতি তখনও যায়নি। বিকেল গেল, সন্ধ্যে গেল—তাও চলছি। নির্জন শুষ্ক প্রান্তর। মাঝে মাঝে বরফের চাপ। আকাশে চাঁদের আলো। আর আমরা দুজন সারারাত ধরে এগিয়ে চলেছি। অমন সুন্দর চাঁদের দিকে তাকাবার ফুরসত পর্যন্ত ছিল না।

"সে রাতের ক্লান্তি আর উত্তেজনার কথা আমি কোনদিন ভুলব না। এত কষ্ট আর হয়নি। খাম্‌-পারা কেন আমাদের ছেড়ে দিল এখন বুঝেছি। সেই টিলাটার ওপারে একেবারে পরিত্যক্ত এলাকা। প্রাণীর প্রাণের নামগন্ধও নেই। এমন জায়গায় আমাদের কাবু করা সহজ হবে না বলেই চম্পট দিয়েছে।

"খাম্‌-পারা তো চলে গেল। মানুষের ভয় কাটালুম। কিন্তু প্রকৃতি? তাঁর দৌরাত্ম্য যে খাম্‌-পাদের চেয়েও বেশী। এই প্রাণহীন শুষ্ক প্রান্তর চলে গেছে মাইলের পর মাইল। শেষ নেই। এই মরুকান্তার আমাদের পেরোতে হবে। তার উপর শীতের কামড়। ভাগ্যিস থার্মোমিটারটা হারিয়ে গেছে। নইলে হয়তো দেখতুম মাইনাস একশ ডিগ্রী। কিংবা আরও বেশী।

"বরফের চাপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে শতচ্ছিন্ন দেহমন নিয়ে আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা চলেছে। এক একবার মনে হচ্ছে, কেন মরতে এলুম। আবার পরমুহূর্তে মনে হচ্ছে, প্রকৃতির বাধা জয় করবই। লাসা পৌঁছবই।

"ক্লান্তির ভারে পা আর চলে না। থামলুম। বের করলুম শুকনো মাংস। কম্বল মুড়ি দিয়ে মাংসে কামড় দিতে গেলুম। যা ভেবেছিলুম, তাই। মাংসের টুকরো ঠক্‌ করে দাঁতে লাগল।

বরফ হয়ে গেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির দফারফা এইখানেই। 'ধুত্তোর' বলে ঘুমিয়ে পড়লুম। এত শীত সত্ত্বেও ক্লান্তির চাপে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল। ক্লান্তিহরা ঘুম।

"ভোরবেলা ফের যাত্রা। একঘেয়ে একটানা। বরফ ভাঙা। কোথাও কিছু নেই—শুধু বরফ আর বরফ। বিকেল গড়িয়ে এল।

"হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ দূরে তাকিয়ে দেখি আবছা আবছা মত চমরী গাইয়ের তিনটি ক্যারাভান। সত্যি তো? না মরীচিকা? গতি বাড়ালুম। না, না, না—মরীচিকা নয়, ক্যারাভানই। 'ওরা থেমেছে। ওরা থেমেছে।' আমরা আনন্দে চীৎকার করে উঠলুম।

"শেষ শক্তি প্রয়োগ করে গতির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলুম। সন্ধ্যের অন্ধকারে পৌছলুম থেমে যাওয়া ক্যারাভানের কাছে। আমরা তখন মানুষ নই, যন্ত্র।

"ওদের তাঁবুর কাছে পৌছতেই দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। আমাদের আর শক্তি নেই, আর ক্ষমতা নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। দম দেওয়া যন্ত্র একেবারে থেমে গেছে।

"ওরা দলে ছিল জন পনের লোক। আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রায় অচেতন আমাদের ঝাপসা ঝাপসা মনে হল, ওদের কে যেন আমাদের দুজনকেই টেনে আগুনের কাছে নিয়ে এল। আগুনের আঁচে আর ওদের দেওয়া খাবারে আমরা সম্বিৎ ফিরে পেলুম। মনে হল, এই দলটি ভগবান প্রেরিত। আমাদের বাঁচাতে দেখা দিয়েছে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে, শীতে আমরা তখন মৃত্যুপথের যাত্রী।

"অনেক পরে চাঙ্গা হয়ে জানতে পারলুম দলটি তীর্থযাত্রী আর ব্যবসায়ীর। কৈলাস পর্বত থেকে তীর্থ সেরে তাদের বাড়ি নাম্‌ৎসো হ্রদের দিকে যাচ্ছে। খাম্‌-পাদের ভয়ে কঠিন পথে চলেছে। ওরা আমাদের দুজনকে বলল, ওদের দলে ভিড়ে যেতে। রাজী হয়ে গেলুম।

"আমাদের চমরী গাই—সেও ধুঁকছে। বেচারা মাল বয়ে

নিয়ে এসেছে এত কষ্ট করে। তাকে খাওয়ালুম, আগুনে গা সেঁকলুম। কুকুরটার অবস্থাও কাহিল।

"ঐ দলের সঙ্গে এগিয়ে একের পর এক দিন কাটতে লাগল। ভগবানের আশীর্বাদেই যেন এই দলের নাগাল পেয়ে গেছি। সব দিকেই এখন স্বস্তি। একটি মাত্র অসুবিধে। বড় আস্তে আস্তে এরা চলছে। আমাদের যে আর তর সইছে না। কিছুদিন পর ঠিক করে ফেললুম, দল ছেড়ে আমাদের আলাদা যেতে হবে।

"দলের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে লাসা যাবার পথটা ভাল করে জেনে নিলুম। পথে কোন্ কোন্ জায়গা পড়বে, তাও টুকে নিলুম। এবং শেষমেষ বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলুম। তারপর আমরা দুজন আবার একা। সঙ্গে চমরী গাই আর কুকুর।

"সারাদিন হাঁটার পর এক তাঁবুতে পৌঁছলুম। তাঁবুর লোকটা এক হাতে এক তরোয়াল নিয়ে বাইরে দাঁড়াল। আমরা রাতের আশ্রয় চাইলুম। লোকটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলল —'গোল্লায় যা।'

"আমরা দমলুম না। দু হাত তুলে নিরস্ত্রের ভূমিকা নিয়ে করুণ কণ্ঠে বললুম—'আমরা তীর্থযাত্রী'। লোকটার গলা নরম হল। হওয়ারই কথা। আমাদের শীর্ণ কঙ্কালসার করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে সকলেরই করুণা উদ্রেক হওয়ার কথা।

"পাশের এক তাঁবুতে আমাদের হেলাভরে থাকতে দিল। অনাদরে ছুঁড়ে দিল দু টুকরো পাঁউরুটি। এতদিন পরে পাঁউরুটির মুখ দেখলুম। কিন্তু কি শক্ত! দাঁতের সঙ্গে পাঁউরুটির দস্তুরমত লড়াই লেগে গেল। সেদিন ছিল 'ক্রিসমাস-ইভ'। মনে হল, এই শুকনো শক্ত পাঁউরুটির টুকরো বড়দিনের চল্লিশপদী খানার চেয়ে ঢের ঢের ভাল।

"লোকটার কাছে আমাদের লাসা যাওয়ার কথা পাড়লুম। নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল, 'ঐ আশা ছেড়ে দাও ভায়া। এখন পর্যন্ত

খাম্‌-পাদের হাতে প্রাণ দাওনি বলে ভেবো না নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ, দু-একদিনের মধ্যে প্রাণ দেহের খাঁচা ছেড়ে পাঁই পাঁই দৌড়োবে। সাবধান।' লোকটার মতে অস্ত্রহীনভাবে লাসার পথে এগোনোর মানেই মৃত্যুর ফাঁদে আটকে পড়া।

"আমরা একেবারে দমে গেলুম। কি করা উচিত জানতে চাইলুম।

"লোকটা বলল—'বরং শিগাৎসে হয়ে যাও। যেতে এক হপ্তা লাগবে।'

"রাজী হলুম না। লোকটা আবার বলল, 'তাহলে জেলা-অফিসারের সঙ্গে দেখা কর। কাছেই তাঁর তাঁবু। তিনি সশস্ত্র সঙ্গী দিয়ে দেবেন। খাম্‌-পা ডাকাতের রাজত্ব দিয়ে তাহলে যেতে পারবে।'

"এই সুপারিশে রাজী হয়ে গেলুম। জেলা-অফিসার লোকটা ভাল। আমাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন, এতদিন পর এই প্রথম জানলুম, আমরা তীর্থযাত্রী নই, ইউরোপীয়। এবং রক্ষা করার আবেদন জানালুম। আমরা সেই পুরাতন ট্রাভেল পারমিটটাও পেশ করলুম। যে পারমিট আমরা গারতোকে যোগাড় করি, সেইটা।

"এখানে বলে রাখি, পারমিটটা কার কাছে থাকবে তাই নিয়ে আমি আর কোপ 'টস' করি। টসে কোপ জেতে। তারপর কোপ যখন আমাদের দল ছেড়ে যায়, তখন তার কাছ থেকে ঐটে আমি চেয়ে রাখি। এই মুহূর্তে সেই পারমিটটা কাজে লেগে গেল।

"জেলা-অফিসার পারমিটটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর চেহারা দেখে মনে হল, আমাদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু একটা খটকা তাঁর লাগল। জিজ্ঞেস করলেন—'পারমিটে তিনজন লোকের কথা লেখা আছে। আর একজন কোথায়?'

"আমরা বললুম, 'তৃতীয় ব্যক্তি ট্রাহুন হয়ে ভারত চলে গেছে।' জেলা-অফিসারের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। বললেন, আমাদের তিব্বত ভ্রমণ সম্পূর্ণ আইনানুগ। আমাদের একজন সঙ্গী দিতেও রাজী হয়ে গেলেন। সঙ্গীটি আমাদের উত্তরের বড় রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। একেবারে পয়লানম্বরী বড়দিনের উপহার। লাখ টাকার উপহার এর কাছে লাগে না।

"তারপর 'রীলে রেস' করে গাইডরা আমাদের নিয়ে চলল। কয়েক মাইল গিয়ে গাইড বদল হয়। একজন আর একজনের হাতে আমাদের সঁপে দেয়। আমরা এগিয়ে চলি। স্থায়ী সঙ্গী শুধু দুরন্ত বাতাসের চড়চাপড় আর শীতের কুটুস কামড়। জুতো ছিঁড়ে পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। হাতের দস্তানাও কাহিল। সারা মুখে 'ফ্রস্ট বাইটে'র চিহ্ন।

"পাঁচদিন হাঁটার পর তাসাম রোড। আগে মনে হয়েছিল তাসাম রোডে এলেই বোধ হয় আমাদের কষ্ট কমে যাবে, ভাল রাস্তা পাব। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নামেই তাসাম রোড, 'রোডে'র আঁচড়ও নেই। হতাশায় মন ভরে গেল। সেই আগেকার মতই তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

"যাই হোক, এগোতে এগোতে পিছনে ফেলে এলুম বরফের স্তূপ। এখন রাস্তা অনেকটা ভাল। ভাল মানে মন্দের ভাল। লাসা আর পনের দিনের পথ। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে আনন্দ প্রকাশের কোন অবকাশই নেই।

"আমাদের চেয়েও দুরবস্থা আমাদের কুকুরের আর চমরী গাইয়ের। কুকুরটির অবস্থা দেখে কান্না পায়। কিন্তু কিছু করার নেই। আমরা নিজেরাই খেতে পারিনি। কুকুরকে কি খাওয়াব। খাবার ফুরিয়ে গেছে, টাকা ফুরিয়ে গেছে। তার উপর শীতের দাপটে তার পা ফালা-ফালা। বেচারা হাঁটতে পারছে না। মালবাহী চমরী গাইয়ের অবস্থাও তদ্রূপ।

"এক বড় রাজকর্মচারীর ক্যারাভানের সঙ্গে দেখা। উনি

আমাদের প্রশ্ন করতেই অগতির গতি সেই ট্রাভেল পারমিট দেখালুম। দেখে বললেন, তাঁর দলের সঙ্গে এগোতে। আমাদের তখন বিশ্রামের দরকার। কিন্তু দলের সঙ্গে নিরাপদে যাবার ভরসায় বিশ্রামের আশা বিসর্জন দিলুম। আমাদের তখন অস্থি-কঙ্কালসার চেহারা, একহাঁটু দাড়ি। হাতে পায়ে মুখে কাটার দাগ, ছিন্ন বস্ত্র। এক কিম্ভূতকিমাকার প্রেতাত্মার প্রতিমূর্তি। একজন আরেকজনের চেহারা দেখে আঁতকে উঠি।

"পথে এক বিশ্রামশালায় আমার এতদিনের সঙ্গী প্রিয় কুকুরকে বিদায় দিতে হল। চিরবিদায়। বিশ্রামশালা ছেড়ে যাবার সময় তাকে আর সঙ্গে নিলুম না। অজ্ঞাতে ফেলে চলে এলুম। সে তখন মরণের প্রতীক্ষায় ধুঁকছে। তাই ভাল পথে মরার চেয়ে এইখানে তাঁবুর ভিতরে স্বস্তিতে মরা ভাল। নিজের জীবন নিয়ে তখন টানাটানি ; কুকুরের জীবন নিয়ে ভাববার ফুরসত নেই। তবু কেন জানি না, আমার মত কাটখোট্টা মানুষের চোখেও এক ফোঁটা জল ছলছল করে উঠেছিল। সে কি ঐ দুঃখদিনের সাথী বিশ্বস্ত প্রিয় কুকুরটির জন্যে ? হয়তো তাই।

"আউফশ্নাইটের বলল, 'কি হল হাইনরিখ ?'

"বললুম, 'জানি না, কি জানি কেন চোখ বড় জ্বালা করছে।'

"কয়েকদিন পর আমাদের চমরী গাইকেও খুঁজে পাই না। জায়গাটার নাম 'লোলাম'। সে কি কোথাও মরে পড়ে রইল ? কিংবা কে জানে, কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে।

"না, মরেনি ; চুরিই করেছে। লোলামের কয়েকজন লোক চুরি করে বেচারাকে কেটে ফেলেছে। মাথায় বজ্রাঘাত। আমাদের এই পাঁচ নম্বরের চমরী গাই দারুণ সার্ভিস দিয়েছে। আমাদের বাঁচিয়েছে। তার মৃত্যুর শোক কম নয়। কিন্তু শোকপ্রকাশের সময় নেই। আমাদের বড় চিন্তা, এখন মালগুলো নিয়ে যাই কি করে ?

"এদিকে ক্যারাভান এগিয়ে গিয়েছে। আমরা মাল ঘাড়ে

চাপিয়েই বরাতকে ধিক্কার দিতে দিতে তাদের সঙ্গ ধরি। কিছুদিন চলার পর একসার গিরিশ্রেণীর মাঝখানে পড়ি। তার মাঝখানে এক সরু গিরিপথ দিয়ে সোজা লাসা।

টোকার নামে এক জায়গায় গিয়ে থামলুম। তারপর উঁচু পাহাড় চড়ার পালা! একে শরীরের এই অবস্থা, তার উপর ঘাড়ে বোঝা।

এদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য এককথায় চমৎকার। কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগের মত মনমেজাজ বা শরীর নয়। প্রায় বিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে পেলুম গুরিং গিরিপথ। আমাদের আগে আর একজন মাত্র ইউরোপীয়, নাম লিটলহেড, ইংরেজ,—১৮৯৫ সালে এই গিরিপথে আসেন। স্বেন হেডিনের মতে ট্রান্স হিমালয়ের এইটেই সবচেয়ে উঁচু গিরিপথ। আপনাকে ঐ গিরিপথের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারব না। আমার সাধ্যিই নেই। আপনি বরং চোখ বুজে কল্পনা করে নিন। তাতেই কিছুটা আন্দাজ হবে। তবে পুরোটা আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।”—হারের আমাকে বলেন।

“সামনে তাকালুম। এদিকে ওদিকে পবিত্র প্রার্থনা-পতাকা পতপত করে উড়ছে। অযুত তীর্থযাত্রীর কণ্ঠে আকাশবাতাস গমগম করা ‘ওম্ মণিপদ্মে হুম্’ মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনি। আর সামনে? সামনে পবিত্র নগরী লাসার পথ, নিষিদ্ধ নগরী লাসার পথ খোলা। দুর্গম গিরি কান্তার মরু পেরিয়ে এই গিরিপথের উঁচুতে দাঁড়িয়ে লাসার পথ দেখতে পাওয়ার আনন্দ বর্ণনা করতে পারে কে? কেউ পারে না। আমি পারব না। আনন্দে আমাদের দুজনের চোখে জল এল।

“আমাদের পাশে আরও বহু তীর্থযাত্রী। লাসা যাত্রী। এরাও দুস্তর দূর দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। আমাদের আনন্দ এদের সকলের আনন্দের সঙ্গে মিশে এক স্বর্গীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করল।

সবাই একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সামনের পথের দিকে। লাসা আর দূরে নয়। ওম্ মণিপদ্মে হুম্।

"ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলুম। মনে হচ্ছিল, একটা 'স্কী' পেলে হত। চমৎকার তরতর করে বিদ্যুৎগতিতে নেমে যাওয়া যেত। থামলুম এসে এক পাহাড়ী ঝরনার কাছে।

"এবারে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমাদের দলে আছে এক তরুণ দম্পতি। ঝরনার পাশে বিশ্রাম নিতে নিতে মেয়েটির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি। সদাই হাসিখুশী। লাবণ্যে মুখ ভরা।

"মেয়েটি একথা-সেকথার পর বলল, এতদিন সে ছিল চাং থাং এলাকায় এক যাযাবর তাঁবুতে। তিন স্বামীর সুখের সংসারে। তিন স্বামী তিন ভাই। হঠাৎ এল ঝড়। বনে নয় মনে। এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় তাঁবুর ভিতর এল এক অচেনা পরদেশী। অতিথি। তারপর সব ভুল হয়ে গেল। সমাজ সংসার মিছে সব। পরদিন সকালে তাঁবুর পিঞ্জর খালি। পাখি উড়ে গেছে। অচেনা পরদেশীর হাতে হাত মিলিয়ে চোখে চোখ রেখে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এখন নতুন জীবন শুরু করার আশায় ওরা চলেছে লাসা।

"কথা বলার সময় মেয়েটির চোখ আনত হল, টুকটুকে নরম গালে বারবার টোল পড়ল। আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অচেনা পরদেশীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কৌতুকের হাসি।

"এই দুঃখকষ্টের মাঝখানে মেয়েটির ঘরোয়া জীবনের কাহিনী আমাদের কাছে অমৃতের স্বাদ এনে দিল। মনে পড়ে গেল নিজেদের ঘরবাড়ির কথা। ওরা সুখী হোক।

"আরও কয়েক দিন হাঁটার পর জনবসতি পেলুম। বাড়িঘর, মঠ। জায়গার নাম সাম্‌সার। এগোবার সময় আমার পায়ে সাইটিকার ব্যথা ওঠে। নড়তেই পারি না। সম্ভবত এতদিন বরফের উপর শুয়ে শুয়ে এই সর্বনাশটা হয়েছে। আউফশ্লাইটের

এক গরম জলের ঝরনা থেকে জল এনে আমার পায়ে সেঁক দেয়। আমি আবার দাঁড়াতে পারি।

"তারপর ইয়াং-পাচেন জেলা পেরিয়ে এক উপত্যকায় পড়লুম। তারপরেই লাসা। কিন্তু লাসায় ঢুকতে পারব তো? আমাদের তো পারমিট নেই।

"লাসা! ঐ একটি নাম এতদিন আমাদের বুকে সাহস দিয়েছে। এত দুর্দশার মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। সেই লাসার কাছকাছি এসে গেছি। পারমিটের কথা ভুলে আমরা সেই আনন্দেই মশগুল।

"পরদিন সকালে 'দেচেন'। পথে এক তরুণ ভিক্ষুর সঙ্গে ভাব হয়েছে। তার সহায়তায় 'দেচেনে' সারাদিন কাটালুম। লাসা আর মাত্র তিন দিনের পথ।

"লাসা পেঁছিবার আগের রাত কাটালুম এক চাষীর বাড়িতে দারুণ উত্তেজনার মধ্যে। জায়গার নাম নাংৎসে। কাল দিনের বেলা লাসায়—স্বপ্নের দেশ, দুঃখশেষের দেশ লাসায়।"

হারের গল্প বলা থামালেন। বললেন, "যাই, চার্চিলের কাছ থেকে লাস্ট শ্লিপটা নিয়ে আসি।"

রাত তখন নটা-সাড়ে নটা। শিলিগুড়ি শহর নিঝুম। হঠাৎ শুধু পথ-চলতি রিক্সার 'ভপ্ ভপ্' এবং দূর থেকে ভেসে আসা টেলিগ্রাফ অফিসের 'টরে টক্কা টরে'।

হারের টেলিগ্রাফ কাউণ্টার থেকে ফিরে এসে বলেন, "ইশ, অনেক রাত হয়ে গেল। কত বলব, এ গল্পের শেষ নেই। ক্যিরোংয়ের আগেকার কথা বাদ দিই। ক্যিরোং ছাড়ার পর ছ শ মাইল পেরোতে আমাদের সত্তর দিন লেগেছে, মাঝে মাত্র পাঁচ দিনের বিশ্রাম। অর্থাৎ দিনে গড়ে দশ মাইল হাঁটা। পথে ক্ষুধা, ভয়, ক্লান্তি, বিপদের পর বিপদ।"

"কিন্তু সব বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা পেঁছিছি লাসায়"—হারের গল্পের শেষ খেই ধরেন:

"মনে দারুণ চিন্তা, যদিবা লুকিয়ে শহরে ঢুকে পড়ি, থাকার অনুমতি মিলবে তো? কাকে ধরব? কার কাছে যাব? আমাদের দেখে আমাদের কথা শুনে কি কারও মন গলবে না? গলবে। কিন্তু চেহারার যা ছিরি হয়েছে। প্রথমে দেখে চোর ডাকাতই ভাববে। লম্বা দাড়ি, ময়লা ছেঁড়া জামা, উস্কোখুস্কো চুল, হাতে পায়ে মুখে কাটার দাগ, কঙ্কালের মত চেহারা।

"১৯৪৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী। আমাদের শেষ 'মার্চ'। তোলুং থেকে 'কী' নদীর পারে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় হাজার হাজার তীর্থযাত্রী চলেছে। তাদের পেছন পেছন আমরা,—দুই ভবঘুরে ইউরোপীয়। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি।

"সামনে তাকালুম। দেখি বাড়ির পর বাড়ি। তার মাঝখানে পাহাড়ের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক সোনায় মোড়া বিরাট বাড়ি। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে সেই বাড়ির চূড়ো। এই হল পোতালা। জীবন্তবুদ্ধ ভগবান দলাই লামার আবাস। তীর্থযাত্রীদের দল নতজানু হয়ে প্রণাম জানাল। আমরাও মাথা নিচু করলুম। লাসা আর তিন মাইল বাকী।"

হারের বলেন—"লাসায় পৌঁছে প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়েছিল আমাদের। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লোকজনের সদয় ব্যবহারে আমরা সেখানে থাকার অনুমতি পেয়ে গেলুম। এবং আরও আশ্চর্যের কথা, শেষ পর্যন্ত হঠাৎ এক দৈব যোগাযোগে দলাই লামার সঙ্গে আমাদের ভাব হয়ে গেল। আউফশ্নাইটের আর আমি লেগে গেলাম তিব্বতের উন্নতির কাজে। লাসা হয়ে গেল আমাদের দেশ। সে এক রোমাঞ্চকর সুদীর্ঘ কাহিনী। বলার সময় নেই। তিব্বত ছেড়ে চলে আসার ইচ্ছেও ছিল না কোনদিন। কিন্তু কি করব, সবই বরাত। আবার একদিন তিব্বত ছাড়তে হল প্রাণের দায়ে। ১৯৫০।৫১ সালে কম্যুনিস্ট চীন হঠাৎ হানা দিল তিব্বতে। সমস্ত দেশ জুড়ে হৈ-চৈ, ভীতি আর সন্ত্রাস। সবাই চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে। আমরাও পালাবার জন্যে

মনস্থির করে ফেললুম। স্বয়ং দলাই লামা আমাদের সঙ্গী হলেন। তিনিও আসবেন ভারতে। অনেক দূর এসেছি একসঙ্গে। কিন্তু মাঝপথ থেকে তিনি ফিরে যান। আমরা চলে আসি। ইয়াতুং, নাথুলা, গ্যাংটক, কালিম্পং হয়ে কলকাতা। তারপর নিজের দেশে—অস্ট্রিয়ায়। আউফশ্লাইটের চলে গেল নেপাল।"

হারের শেষ সিগারেটে আগুন ধরিয়ে প্যাকেটটা দূরে ফেলে দিয়ে খানিকটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—"সেই পালাতে হল দলাই লামাকে। চীনাদের সঙ্গে তার বনিবনা হবে না জানতুম। দলাই লামাকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে। ভারতবর্ষের জয় হোক।"

হারের চাচিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালপত্র গোছাতে লাগলেন। এখনি আবার কলকাতা ছুটতে হবে।

আমিও ভাবছিলাম দলাই লামার কথা। এই তো একটু আগে শিলিগুড়ি স্টেশনে তাঁকে বিদায় দিলুম। স্মিতহাস্যে তিনি সকলের অভিনন্দন নিলেন। কিন্তু তাতেও ঢাকা পড়েনি তাঁর চোখের কোণে বিষাদের কালো ছায়া। দারুণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি-কামনায় তিনি বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনের এই পথ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। জানি না, ইতিহাস তাঁকে কোথায় কোন্ পথে নিয়ে যাবে। আবার কি তিনি ফিরে যেতে পারবেন তাঁর প্রিয় বাসভূমি লাসায় ?

অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে দলাই লামা সদলবলে এলেন ভারত-তিব্বত সীমান্তের তোয়াং মঠে। তোয়াং থেকে দুর্গম গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন হাঁটতে হাঁটতে ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আসেন নেফার কামেং ডিভিশনের সদর দপ্তর ৭০ মাইল দূর বমডিলায়। বমডিলা থেকে খেলাং হয়ে ৬০ মাইল দূর ফুট হিলস। সেখান থেকে তেজপুর। তেজপুর থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে মুসুরী। পথে শিলিগুড়ি।

দলাই লামার সঙ্গে আছেন ৯০ জন লোক। আছেন মা, এক বোন, এক ভাই ও অন্যান্য পরিজন। দুজন গৃহশিক্ষক, মন্ত্রী-সভার তিনজন সদস্য, একজন প্রধান গৃহাধ্যক্ষ, তিনজন প্রধান পরিচালক,

একজন গৃহাধ্যক্ষ, গন্দন, সেবা ও দ্রেপুং মঠের একজন করে প্রতিনিধি, অন্যান্য অফিসার ও ভৃত্যবর্গ।

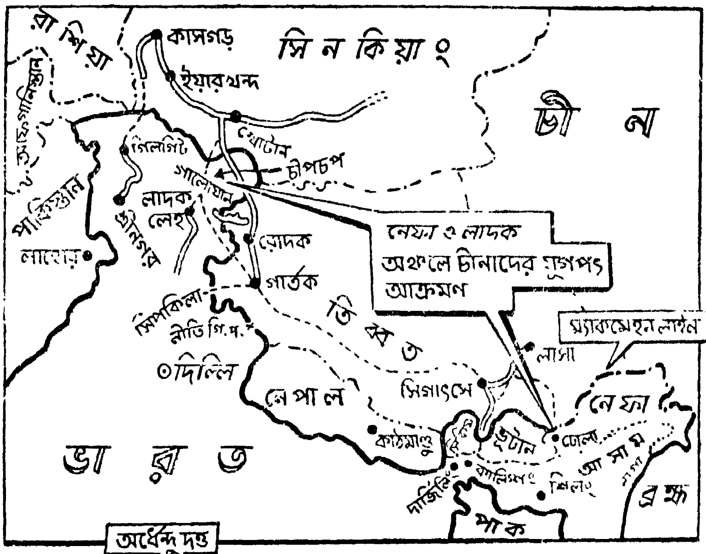
তেজপুরে এক সম্বর্ধনা সভায় দলাই লামা দিলেন এক চমকপ্রদ বিবৃতি। তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন; বিপ্লবীদের জবরদস্তিতে নয়, স্বেচ্ছায় তিব্বত ছেড়ে তিনি ভারতে এসেছেন। দলাই লামা আরও বললেন—চীনা কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালের চুক্তি উপেক্ষা করে বারবার তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন এবং তার ফলেই চীন-তিব্বত ১৭ দফা চুক্তি ব্যাহত হয়। ওই চুক্তিতে তিব্বত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করতে পারবে বলে ঠিক হয়েছিল।

দলাই লামা বললেন, ১৭ই মার্চ নরবুলিংগা প্রাসাদের উপর চীনারা মর্টার চালিয়ে গুলীবর্ষণ করে। ওই সংকটজনক অবস্থাতেই তিনি সপরিবারে লাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। উন্মুক্ত উদারতায় প্রসন্ন বাহু প্রসারিত করে ভারতবর্ষ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে বলে দলাই লামা ভারতবাসীকে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। জীবন্তবুদ্ধকে ভারত আশ্রয় না দিলে আর কে দেবে। ভারত যে বুদ্ধের দেশ।

আবার হারেরের গলা। বাঁধাছাঁদা শেষ। আমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। চার্চিল দূর থেকেই হাত নাড়লেন। ছুঁড়ে দিলেন মিষ্টি হাসির টুকরো।

আমি এতক্ষণ ছিলুম অন্য জগতে। হারেরের বিদায়-ভাষণে সম্বিৎ ফিরে এল। তাঁর হাতে হাত ঠেকিয়ে স্বপ্নচালিতের মত বললুম—"অনেক কষ্ট দিলুম আপনাকে। তার বদলে আমরা আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। গল্প শোনার সময় মনে হয়েছে, আমরা দুজনও যেন আপনাদের দুজনের সঙ্গী হয়ে দূর দুর্গম পথে পাড়ি দিচ্ছি। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। আর হয়তো দেখা হবে না, তবু মনে মনে কামনা করছি আবার যেন দেখা হয়। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। 'ডাংকে গুটে নাখট'।"

পরিশিষ্ট



ভারত আর চীনের চিরাচরিত সীমারেখা। চীন রেখা মানছে না।

স্বাধীনতালাভের পর ভারত-চীন সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৯৪৭

১৫ই আগস্ট : ভারতের স্বাধীনতা লাভ। উত্তরাধিকারসূত্রে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে তিব্বত সম্পর্কে কতক অধিকার লাভ।

১৯৪৯

১লা অক্টোবর : চীনে কম্যুনিস্ট সরকার কায়েম।

৩০শে ডিসেম্বর : নতুন চীনকে ভারতের স্বীকৃতি দান।

১৯৫০

১৩ই আগস্ট : ভারত চীনকে জানায়, চীন-তিব্বত সীমান্ত সুবিন্যস্ত করা হোক।

২১শে আগস্ট : চীন জানায়, শান্তিপূর্ণ পথেই তারা তিব্বত সমস্যার সমাধান করবে এবং ভারত-চীন সীমান্তেরও স্থিতিবিধান করা হবে।

২৪শে আগস্ট : তিব্বত সম্পর্কে চীনের মনোভাবে ভারত সরকার সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জানান যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে স্বীকৃত সীমানা বজায় রাখতে হবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করেন, চীনা গণ-সাধারণতন্ত্রের সরকারকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের চীনের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া উচিত।

৭ই অক্টোবর : চীনা সৈন্যদের তিব্বতে প্রবেশ।

২১শে অক্টোবর : সামরিক বলপ্রয়োগের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতি চীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারত সরকার জানান যে, ভারতের সীমান্তে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হবে।

৩০শে অক্টোবর : চীন অভিযোগ করে যে, তিব্বতের ব্যাপারে ভারত চীন-বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১লা নভেম্বর : ভারত সরকার এই অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং জানান যে, তাঁরা শান্তির পথে সমস্যার সমাধানেরই পক্ষপাতী।

১৯৫১

১লা ফেব্রুয়ারী : কোরিয়ায় চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে প্রস্তাব আসে, ভারত তার বিপক্ষে ভোট দেয়।

৮ই সেপ্টেম্বর : সানফ্রানসিস্‌কোয় ৪৯টি রাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি করে, ভারত এই চুক্তির সম্মেলনে যোগ দেয়নি, চীনকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়নি বলে।

১৪ই নভেম্বর : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের আবার ওকালতি।

১৯৫২

২৫শে অক্টোবর : রাষ্ট্রসঙ্ঘে পুনর্বার চীনকে সদস্যপদে গ্রহণের জন্যে ভারতের দাবী।

১৯৫৩

১৫ই মে : রাষ্ট্রসঙ্ঘে কোরিয়া সম্পর্কে নেহরুর চীনা-নীতি বিশ্লেষণ।

২৮শে সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের দাবি।

৩১শে ডিসেম্বর : ভারতের উদ্যোগে পিকিঙে ভারত-তিব্বত সংক্রান্ত আলোচনা।

১৯৫৪

২৯শে এপ্রিল : তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে আট বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর। তিব্বত সম্পর্কে ভারত বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সব অধিকার পেয়েছিল সেগুলি ত্যাগ করে এবং তিব্বত চীনা এলাকার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে।

২৫শে জুন : রাষ্ট্রীয় সফরে চৌ-এন লাইয়ের দিল্লী আগমন।

২৮শে জুন : ভারত ও চীনের প্রধান-মন্ত্রিদ্বয়ের যুক্ত ইস্তাহারে পঞ্চশীলের পুনরুল্লেখ।

১৭ই জুলাই : উত্তরপ্রদেশের বড়হোতি নামক স্থানে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থিতির বিরুদ্ধে চীন সরকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর পূর্বে চীন সরকার ভারতের কোন এলাকার উপর দাবি জানাননি, বরং ওই বছরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভারতের-অখণ্ডতা তাঁরা কখনই লঙ্ঘন করবেন না।

২৭শে আগস্ট : চীনের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং চীনা কর্মচারীদের

বড়হোতি প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ভারত সরকার একটি পত্র পাঠান।

১৮ই অক্টোবর : শ্রীনেহরুর চীন গমন। ভারতের প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকা চীনের অন্তর্গত বলে দেখিয়ে চীনে যে সব মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি শ্রীনেহরু চীনা নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চৌ এন লাই উত্তরে বলেন যে, এই সব মানচিত্রের খুব গুরুত্ব নেই, কারণ এগুলি কুয়োমিনটাং আমলের পুরনো মানচিত্রের প্রতিলিপি মাত্র।

১৯৫৫

১৮ই এপ্রিল : আফ্রো-এশীয় (বান্দুং) সম্মেলনে চীনের অংশ গ্রহণ। গণ-সাধারণতন্ত্রী সরকারই যে চীনের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী, শ্রীনেহরু এই দাবির সমর্থন করেন এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে চৌ এন লাইকে সাহায্য করেন।

২৮শে জুন : বড়হোতিতে একদল চীনার অনধিকার শিবির স্থাপনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানান।

১৫ই সেপ্টেম্বর : উত্তরপ্রদেশে সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তরে দমজান এলাকায় চীনা সৈন্যদের প্রবেশ।

২০শে সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের প্রস্তাব।

৫ই নভেম্বর : দমজানে চীনা সৈন্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ।

১৯৫৬

২৮শে এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশের নেলাংয়ে আট মাইল ভারতের ভেতরে সশস্ত্র চীনা সৈন্যের অনুপ্রবেশ।

২রা মে : নেলাং সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ।

২৬শে জুলাই : উত্তরপ্রদেশের বড়হোতি নিজ এলাকা বলে চীনের দাবি।

১লা সেপ্টেম্বর : চীনা সৈন্যের সিপকি গিরিপথে ভারতে অনুপ্রবেশ।

৮ই সেপ্টেম্বর : সিপকি গিরিপথ সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ।

১০ই সেপ্টেম্বর : চীনা সৈন্যের পুনর্বার সিপকি গিরিপথে অনুপ্রবেশ।

২০শে সেপ্টেম্বর : একটি টহলদারি চীনা দলের সিপকি গিরিপথে অনুপ্রবেশ এবং হুপসাং খুদ পর্যন্ত আগমন।

২৪শে সেপ্টেম্বর : ভারত সরকারের প্রতিবাদ।

১০ই নবেম্বর : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের দাবি।

২৮শে নবেম্বর : চৌ এন লাইয়ের ভারত সফর শুরু। চৌ বলেন, তিনি ম্যাকমোহন লাইন মেনে নেবেন।

১৯৫৭

৫ই জুন : ট্রেড এজেন্সি পদে ইয়াতুংয়ের সব জমি ভারত কর্তৃক চীনকে সমর্পণ।

১৩ই সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের দাবি।

অক্টোবর : লোহিত ডিভিশনের ওয়ালঙে চীনা অনুপ্রবেশ।

১৯৫৮

এপ্রিল-মে : ভারত সরকারের উদ্যোগে দুই সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে বড়হোতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ। চীন সরকার জানান যে, তাঁরা সঠিক খবরাখবর রাখেন না।

২রা জুলাই : লাদাকে চীনা সৈন্যদল কর্তৃক খুরনাক দুর্গ অধিকারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রতিবাদ।

১৪ই জুলাই : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের প্রস্তাব।

৭ই সেপ্টেম্বর : চীনের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলির প্রতি চীনের দাবি শ্রীনেহরু সমর্থন করেন।

সেপ্টেম্বর : লাদাকে আকসাই চীনে কর্তব্যরত একটি ভারতীয় টহলদার দলকে চীনা সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে এবং পাঁচ সপ্তাহ ধরে আটক রেখে তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে।

সেপ্টেম্বর : বড়হোতিতে এবং লোহিত ডিভিশনে চীনা অনুপ্রবেশ।

১৮ই অক্টোবর : আকসাই চীনে চীন সরকার কর্তৃক একটি সড়ক নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানান।

অক্টোবর : উত্তরপ্রদেশের লাপথাল ও সাংচামাল্লায় চীনাদের ফাঁড়ি নির্মাণ।

২৭শে অক্টোবর : পাঞ্জাব ও হিমাচলের ওপর দিয়ে চীনা বিমানের যাতায়াত।

৮ই নবেম্বর : আকসাই চীনের ওপর চীনের দাবিতে ভারতের প্রতিবাদ।

১৪ই ডিসেম্বর : চীনের একটি সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত মানচিত্রে ভারত-চীন সীমান্ত সঠিক ভাবে অঙ্কিত না হওয়ায় শ্রীনেহরু মিঃ চৌ এন লাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৫৯

১৭ই জানুয়ারী : ওয়ালঙে চীনা অনুপ্রবেশে ভারতের প্রতিবাদ।

২৩শে জানুয়ারী : মিঃ চৌ উত্তরে জানান যে, ভারত-চীন সীমান্তরেখা কখনই সরকারীভাবে চিহ্নিত হয়নি এবং ম্যাকমোহন লাইনও চীন কখনও স্বীকার করেনি। ১৯৫৪ সালে যে এই প্রশ্ন তোলা হয়নি তার কারণ তখন এই সমস্যা মীমাংসার উপযোগী আবহাওয়া তৈরি হয়নি।

৩১শে মার্চ : দলাই লামার ভারতে প্রবেশ ও রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ।

২৬শে এপ্রিল : দলাই লামাকে আশ্রয় দানের জন্য চীনের দায়িত্বশীল লোকেরা যে-ভাবে ভারতের প্রতি অসঙ্গত ও অশোভন আক্রমণ চালাচ্ছেন, ভারত সরকার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

১১ই জুলাই : তিব্বতে ভারতীয় ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী ও নাগরিকদের যে বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার প্রতি ভারত সরকার চীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৪ই জুলাই : রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে গ্রহণের জন্যে ভারতের দাবি।

২৮শে জুলাই : চীনা সৈন্যের লাদকে পাংগং হ্রদে অনুপ্রবেশ এবং স্পাঙ্গুরে একটি শিবির বানিয়ে ছজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার।

৩০শে জুলাই : ভারতের প্রতিবাদ।

৭ই আগস্ট : খিনজেমানেতে চীনা সৈন্যের অনুপ্রবেশ।

১১ই আগস্ট : ভারত সরকারের প্রতিবাদ।

২৫শে আগস্ট : একটি বিরাট চীনা সৈন্যদল নেফায় সুবনসিরি বিভাগে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণের পর লংজু অধিকার করে।

২০শে অক্টোবর : চীনা সৈন্যরা ভারতীয় এলাকায় ৪০ মাইল অভ্যন্তরে লাদকের কোংকা গিরিপথে প্রবেশ করে এবং নয়জন ভারতীয়কে হত্যা করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে।

২৩শে অক্টোবর : ভারত সরকারের প্রতিবাদ।

১৬ই নবেম্বর : অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারত সরকার লাদাকে পারস্পরিক মানচিত্র অনুযায়ী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব করেন।

১৭ই ডিসেম্বর : চীন সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।